# সাহিত্যমঙ্গল।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রণীত।



কলিকাতা

৩৪ নং নিয়োগীপুকুর ইষ্ট লেন, তালতলা

নবজীবন যন্ত্রে

শ্রীসিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৫ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা।

# উৎসর্গ।

ভাই! তুমি সাহিত্যধর্ম্ম বড় ভাল বাসিতে। তোমার সাহিত্যানুরাগ ধর্ম্মানুরাগের অপর নাম,—দুইই এক সুন্দর সূত্রে গ্রথিত ছিল। সে সব কথা, আজ অতীতের অজ্ঞানিত কাহিনীতে,—আমার দগ্ধহৃদয়ের স্মৃতিতে পরিণত!! যে দিন এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম সে আর আজ ক' দিন! কিন্তু 'এই ক দিনে' জীবনের কত যুগ মহাযুগ যে বহিয়া গিয়াছে, তাহা আর কাহাকে বলিব! যে দিন এই প্রবন্ধ লিখি সে দিন তুমি আমার নিকটে,—আহা কত দিনের পর বাড়ীতে এসে ছিলে, দেখে ছিলে সে কি প্রফুল্লতার দিন! আমরা;—যা কিছু লইয়া তখনও 'আমরা' ছিলাম,—সব একত্রে। তোমার শান্তমূর্ত্তি সম্মুখে, আমি বসিয়া লিখিতেছি, লিখিতে লিখিতে তোমার প্রসন্ন মুখখানি এক এক বার দেখিতেছি,—সে মুখ আর কি কখনও দেখিব! * * * * মুখখানি এক এক বার দেখিতেছি আর সেই মুখের মিষ্ট কথাগুলি,—সে কত বিষয়েরই, না কথা,—ধর্ম্ম, সমাজ. সাহিত্য, চিকিৎসাশাস্ত্র কত বিষয়েরই কথা শুনিতেছি; এক এক বার,—সে প্রায় প্রতি মিনিটেই,—লেখা ছাড়িয়া তোমার সহিত কথা কহিতেছি,—আবার লিখিতেছি;—ওদিকে পশ্চাত হইতে, আমার চেয়ারের পায়া ধরিয়া একটি চাঁপাফুলের মত ছেলে কতক্ষণ নাচিয়া নাচিয়া আপন মনে আপন ভাষায় কত কি গাইয়া গাইয়া আমার কোঁচার কাপড় ধরে টানিতেছে,—কোলের উপর উঠিয়া বসিতে চায়! ভাই সেই এক দিন যে দিন এই প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম আর আজ আর এক

দিন যে দিন এ প্রবন্ধ সাধারণে প্রকাশিত হইতে চলিয়াছে! সে দিনে এ দিনে দু'টী অনন্ত জীবনের অন্তর! তোমাদের মিষ্ট মধুর হাসির আলোকে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তাহা আজ অশ্রুজলের অন্ধকারে আমার ভগ্ন হৃদয়ের শোণিতে শিক্ত করিয়া প্রকাশিত করিলাম! এই সে দিনও যে * * * বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে লিখিয়াছিলে "বই-ছাপা হয়েছে, কাহাকে দেখাইব, কাহাকে দিব!!! ইহারই মধ্যে গেলে! দাঁড়াও দাঁড়াও ভাই! আমি তোমার পশ্চাৎবর্ত্তী হই;—দাঁড়াও স্নেহাশ্রুপূর্ণ,—হৃদয়-শোণিত-শিক্ত উপহার গ্রহণ কর, আমি শীঘ্রই আসিতেছি, তোমাকে ছেড়ে আমি এখানে অধিক দিন থাকিতে পারিব না।

——:o:——

# সাহিত্য-মঙ্গল।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

[ ধর্ম্মের অধুনাতন ব্যাখ্যা; বঙ্কিম বাবু ও মিঃ টিণ্ডল, কেশব বাবুর অনুষ্ঠিত 'নববিধান'; ধর্ম্মের অধুনাতন ব্যাখ্যা আর্য্য ঋষিদিগের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মতত্ত্বের প্রতিকূল নয়,—উভয়ই মূলে এক। অসার দ্রব্যের বিলয়ত্ব,—প্রকৃত পদার্থের ধ্বংসহীনত্ব। প্রাচীন বিষয়ের নবীন অঙ্গরাগ,—প্রতিভা। শিক্ষা ও প্রতিভার প্রভেদ, পূর্ণপ্রতিভা, আংশিক প্রতিভা; প্রতিভা নির্ব্বাচন, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমানের সহিত উহার সম্বন্ধ,—প্রতিভা নির্ব্বাচন কঠিন কেন? স্বর্ণ ও গিল্টী,—তুলনায় সমালোচনা। প্রতিভা ও বঙ্গদেশ;—কেশবচন্দ্র সেন ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ]

ধর্ম্ম কথাটা কিরূপ বিশ্বোদর ভাব সম্পন্ন, মনুষ্যের সমগ্র জীবনের সহিত বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতির সহিত ধর্ম্মের কিরূপ ওতপ্রোত সম্বন্ধ, তাহা অদ্যকার বঙ্গ-সাহিত্যের সর্ব্বাগ্রগণ্য লেখক কর্ত্তৃক সবিস্তারে সম্প্রতি

বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। “ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা” প্রবন্ধ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে, আর যত কিছু না হউক, ধর্ম্ম শব্দের পূর্ণ ও প্রকৃত অর্থ অন্তত কিয়ৎ পরিমাণে অনুভূত হয়।

বিলাতের বিজ্ঞানাচার্য্য টিণ্ডল মানব জীবনের লক্ষণ নির্ণয় করিলেন ;—

Life consists not in equilibrium but in the passages towards equilibrium. In man it is the leap from the potential through the actual, to repose.

বঙ্গের বঙ্কিমচন্দ্র ব্যাখ্যা করিলেন যে, ধর্ম্মই সেই passage towards equilibrium এবং equilibrium ব্যতীত repose ( শান্তি ) অসম্ভব।

টিণ্ডল তিন কথায় মানবজীবন বুঝাইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র অতি সহজ উপায়ে দেখাইয়াছেন যে সেই জীবন ধারণ ও রক্ষা করিতে ধর্ম্মই একমাত্র উপায় এবং জীবনের একটী পরমাণুর পরমাণুও ধর্ম্মের সহিত পৃথক হইয়া টিঁকিতে পারে না। সংক্ষেপত ধর্ম্মে ও জীবনে পার্থক্য সম্ভবে না।

টিণ্ডলের লক্ষণ অস্ফুট ও বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যা অশুদ্ধ হইতে পারে ; কিন্তু উভয়েই যে তাঁহাদের বিচার্য্য বিষয়ে আমূল দৃষ্টি চালাইয়াছেন, এ কথা বড় অধিক

লোকে অস্বীকার করিবেন না। পরন্তু টিণ্ডল ও বঙ্কিম উভয়েই যে স্ব স্ব পদ্ধতিতে আধুনিক ব্যবস্থায় সেই আর্য্য ঋষিদিগের শাস্ত্রকথা উদ্ঘাটন করিয়াছেন, ইহাও বোধ হয়, প্রকৃত প্রতিবাদের অতীত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রত্যক্ষ-বিজ্ঞান-শিক্ষক টিণ্ডলের equilibrium ও repose শত সহস্র যুগ পূর্ব্বের আর্য্য ঋষিদিগেরই কথা। আর গুরু-শিষ্য-সম্বাদে বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশ্নোত্তর-মালা আর্য্য শাস্ত্রেরই বর্ত্তমান সময়োপযোগী ব্যাখ্যা *।

* বঙ্কিম বাবুর এই ধর্ম্ম বা ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা প্রণালী,—যদি এত শীঘ্র উহাকে প্রণালী বলা অসঙ্গত না হয়,—অনেক কারণে বর্ত্তমান সময়োপযোগী। একটা মোটামুটী কারণ এই যে, হিন্দু-জাতি বহুকালাবধি শৌর্য্য বীর্য্য হীন ;—শারীরিক শক্তি ও মানসিক বলাভাবে অধঃপতিত। হিন্দুজাতির অন্তত বাঙ্গালীদিগের শরীরটায় একটু বলাধান না হইলে রাজনৈতিক বা বৈষয়িক কোন প্রকার উন্নতিরই সম্ভাবনা নাই। এখন যে ধর্ম্ম-শিক্ষক, সংসারের অসারতা দেখাইতে যাইয়া এবম্বিধ উন্নতি পক্ষে বাধা দিবেন, তিনি বস্তুতই হিন্দুদের পরম শত্রু। আত্মসংযম ভ্রমে, বহুকালব্যাপী আত্মপীড়নে হিন্দুজাতি নিজের অস্তিত্ব নাশের উপক্রম করিয়াছে। এখন আর তাহাদিগকে আত্মপীড়ন শিক্ষা দেওয়া কোন ক্রমেই বিধেয় ও সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বিকৃত 'ব্রহ্মচর্য্যে' দেশ উৎসন্ন যাইবার দাখিল,—একথা আমাদের পুরোহিত ঠাকুরবর্গ আদৌ বুঝেন না। বঙ্কিম বাবু তাঁহার ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় কথাটা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছেন ও যদ্দ্বারা ধর্ম্মত তাহার প্রতিবিধান হয়, তাহার উপদেশ

টিগুল যে equilibriumএর উল্লেখ করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার পরিষ্কার ভাষ্য লিখিয়াছেন। দেখাইয়াছেন যে, 'অনুশীলনে' equilibrium লব্ধ। equilibrium কি না উন্নতি দ্বারা বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতির সামঞ্জস্য সাধন। সামঞ্জস্য-সাধনই ধর্ম্ম, ধর্ম্মই সুখ, সুখই শান্তির (repose) অপর নাম। সামঞ্জস্য দ্বারা শান্তি লাভই ঈশ্বরে লীন হওয়া।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধর্ম্মব্যাখ্যা অপূর্ব্ব হইলেও অযৌক্তিক নয়; অভিনব হইলেও পুরাতন। যুক্তি ও পুরাতনত্ব উহার প্রত্যেক অক্ষরে পরিদৃশ্যমান। তবে বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপ সহজ ও উজ্জ্বল আলোক সংযোগে কথাটা লোকের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ সেরূপ করেন নাই। এই অর্থেই উহা

---

দিয়াছেন। ধারণ করাই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, ধ্বংস করা নয়। বঙ্কিম বাবু একথা বিধিমত প্রকারে বুঝাইতে প্রয়াস পাইতেছেন ও শরীর মনের স্বাভাবিক উন্নতি ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। অতএব ঘোর সাংসারিক চক্ষে দেখিলেও, বঙ্কিম বাবুর এই প্রণালীর মূল্য এ মুহূর্ত্তে অধিকতর। আমাদের 'রাজনৈতিক' প্রচারকগণ কর্ত্তৃক বিষয়টা মনোযোগের সহিত অধীত হইলে ভাল হয়। ফল কথা এই যে, কি ভৌতিক, কি আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম, উন্নতি মাত্রেরই সপক্ষ কদাচ বিপক্ষ নয়। অধর্ম্মই অবনতি, অনবনতিই ধর্ম্ম।

অপূর্ব্ব বা অভিনব। কেশবচন্দ্রের 'নববিধান' প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মও বহু পুরাতন হইয়াও ঠিক ঐ অর্থে নূতন। ফল কথা এই যে, প্রতিভা যেমন নূতন সৃষ্টি করে, তেমনি পুরাতনের ভিতর এমন এক অপূর্ব্ব 'আরক' ঢালিয়া দেয় যে,তদ্দ্বারা বহুযুগের পুরাতন পরিত্যক্ত পদার্থ পরিষ্কৃত হইয়া উঠে ও জনসাধারণের নিকট নূতন বলিয়া প্রতীত হয়।

জগতের পরিবর্ত্তনশীলতার হেতু বিপ্লব বিপর্য্যয়। বিপর্য্যয় বিপ্লবে ভাল মন্দ অনেক দ্রব্য নষ্ট হইয়া যায়। মন্দ দ্রব্য নষ্ট হওয়াই ভাল স্বভাবের নিয়মও তাই। বিকৃত কৃত্রিম সামগ্রী কিছুকালের জন্য সমাদৃত হইতে পারে ; কিন্তু সময়ের গুরুভার সহ্য করিতে পারে না। মুহূর্ত্তের লীলা খেলার পর আপনা হইতেই ধ্বংস হয়। একবার ধ্বংস হইলে প্রায় আর জীবিত হয় না। তরল দ্রব্য পতিত হইলে তোলা যায় না, কেহ তুলে না, তুলিতে পারে না, তুলিবার চেষ্টাও নিষ্ফল। ভুষা জিনিষ চাপা পড়িলে শীঘ্রই পচিয়া যায়, কেহ তাহার খবর লয় না ; কিন্তু যাহা প্রকৃত পরিপক্ক, নিরেট, নিখুঁত জিনিষ, তাহা বহুবিধ বিপ্লব বিপর্য্যয়ে বিঘ্ন বিড়ম্বনার নিদারুণ আঘাত সহ্য করিতে সমর্থ হয়। পৌনঃ-

পুনিক আঘাতে সম্পূর্ণরূপ অক্ষুন্ন না থাকুক, কায়-ক্লেশে প্রায় একরূপ বজায় থাকে। অন্তত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গুঁড়া গুঁড়া হইয়া সাত জায়গায় সাত অবস্থায় স্বস্থান-ভ্রষ্ট হইয়া অবস্থিতি করে। অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া ময়লা মরিচা ধরিয়া মৃত প্রায় পড়িয়া থাকে। পরিপক্ক ফল কালের করাল গ্রাসে নিপতিত হইয়া নিজে নষ্ট হইলেও বীজ রাখিয়া যায়, তদ্দ্বারা সময়ে পুনর্ব্বার বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। যাহা আসল তাহা বিপ্লবে বিনষ্ট হয় না বটে, কিন্তু অনেক সময় পৃথিবীর নিকট তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। তাহার বাহ্য অব-য়ব—উপরকার আকার প্রকার হয় ত বেশ দেখা যায়। কিন্তু যাহা তাহার ভিতরের সার, প্রকৃত বস্তুত্ব তাহা কেহ দেখে না,—দেখিতেও পায় না। এইরূপে দ্রব্যের বীজ বিবর্জ্জিত খোসা,—বাক্যের ভাব বিরহিত ভাষা মাত্র পড়িয়া থাকে। এইরূপে কর্ম্মের কর্ম্মত্ববিহীন কায়া বা ধর্ম্মের ধর্ম্মত্ববিহীন ছায়া সংসারের অনেকটা জায়গা জুড়িয়া অসাড় অচেতনভাবে অবস্থিতি করে। সাধারণ লোক যন্ত্রবৎ সেই কায়া বা ছায়া 'আগলায়'। চক্ষু মুদিয়া সেই ভাষা বা খোসার লালন পালন করে। এরূপ করাও স্বাভাবিক। এরূপ করাতে বিশেষ লাভ

না হউক, বিশেষ ক্ষতিও হয় না। বরং বাকি কাটিয়া শেষে লাভই দাঁড়ায়। কেন না, প্রাগুক্ত অবস্থা বহু-কালব্যাপী হইতে পারিলেও কখনও চিরস্থায়ী নয়; সময়ে দ্রব্যের দ্রব্যত্ব বাহির হইয়া পড়ে। কালক্রমে এমন সকল লোক উদয় হন, যাঁহারা প্রতিভার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, দ্রব্যের আপাদমস্তক বাহির ভিতর দেখিতে পাইয়া তাহার সারত্ব খুঁজিয়া খুঁজিয়া কোথা হইতে টানিয়া বাহির করেন। ভাষার ভাব, খোসার বীজ, কায়ার জীবন ও ছায়ার কায়া খুঁজিয়া আনিয়া জন-সাধারণের সম্মুখে ধরেন। নিদ্রিত মৃতবৎ পদার্থ তাঁহাদের বৈদ্যুতিক স্পর্শে যেন জাগিয়া উঠে। যাঁহারা এইরূপ সুপ্তকে জাগ্রত করেন, শবসাধনে রত হন, তাঁহারা সাধারণ লোক হইয়াও কতকটা অসা-ধারণ পথাবলম্বী। বোলকলায় শব-সাধনক্ষম হইলে ইহাঁরাই কারলাইলের "মহাপুরুষ"।

এ যুগ মহাপুরুষ বিশেষের যুগ নয়;—সাধারণ শিক্ষা বিস্তার ও জ্ঞানাধিকারের যুগ। এ যুগে শিক্ষা-বিস্তৃতি প্রভাবে সমাজের নিম্নস্তর ব্যাপিয়া স্বাধীন চিন্তা প্রবল। এ যুগে মহাপুরুষ বিশেষের প্রয়োজনা-ভাব। যাহার প্রয়োজনাভাব, প্রকৃতি তাহা উৎপাদন

করেন না। সুতরাং মহাপুরুষ বিশেষ এখন আর জন্মেন না; জন্মিবার তাদৃশ আবশ্যক করে না। এখন সমগ্র সমাজ স্বাধীন চিন্তার পশ্চাৎ ধাবিত, সত্য আবিষ্কার ও জীর্ণ সংস্কারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞারূঢ়; কিন্তু অশিক্ষিতের ন্যায় শিক্ষিতদিগেরও ভ্রম আছে—দৃষ্টিদোষ আছে—বিশ্লেষণ, অপটুতা ও নির্ব্বাচন সংকীর্ণতা আছে। অতএব এ যুগে বিষয় বিশেষের জন্য মহাপুরুষ বিশেষের মার্ত্তণ্ড প্রভাব আবশ্যক না হইলেও অপেক্ষাকৃত উচ্চতর মানসিক শক্তিসম্পন্ন লোকের সর্ব্বথা প্রয়োজন হয় এবং এ প্রয়োজনীয়তা বোধ হয়, চিরকাল থাকিবে। প্রতিভার প্রয়োজন আছে ও থাকিবে,—প্রয়োজনানুসারে প্রকৃতি তাহা প্রদানও করিতেছেন। প্রতিভার লক্ষণ বুঝিয়া লওয়া কঠিন বটে, বিশেষত এ যুগে তাহা নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া কঠিনতর। একই শিক্ষা, একই দীক্ষা, একই ভাব, একই অভাব, একই স্রোতে একই পোতে লোকে জীবনের পাড়ি মারিতেছে। বৈচিত্র্য বিশেষত্ব যাহা তাহা সাধারণ। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে উঠিতেছে পড়িতেছে—মরিতেছে বাঁচিতেছে বটে; কিন্তু সমসাময়িক কালে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনও এরূপ স্থলে অবিশ্বাস।

অবস্থাগতিকে যোগ্য মরে অযোগ্যও বাঁচে। অবস্থা সূত্রের জটিল জড়তা, ছাড়াইতে বা ছিঁড়িতে—একালের বিজ্ঞান অদ্যাপি পারেন নাই, সেকালের বিজ্ঞান পারিয়াছিলেন কিনা,—জানিবার জো নাই। যাহা হউক প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ধরিয়া প্রতিভা নির্দ্দেশ করিতে হইলে দূর ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিতে হয়; সমসাময়িক কালে সেকাজে বিরত থাকিতে হয়। বিরত থাকিবারও বিধি আছে। এবিধি খুব ন্যায্য বটে কিন্তু কিছু নিষ্ঠুর। যে জন্য ন্যায্য ও যে জন্য নিষ্ঠুর তাহা বিশেষ বলিবার দরকার নাই,—তাহা সকলেরই সহজবোধ্য। সমসাময়িক লোকে সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের গুণাগুণ বুঝিয়াও উঠিতে পারে না, এবং পক্ষপাত শূন্য হইয়া বিচারও করিতে পারে না—ইহা সত্য। ইহার যে সব কারণ নির্দ্দেশ করা হয়—যে সব অপকারিতা দর্শান হয়, তাহাও খুব যুক্তিযুক্ত। কিন্তু প্রতিভাশালী ব্যক্তি জীবদ্দশায় অন্নমুষ্টি পাইবেন না, একটা মিস্ট কথার ভাগী হইবেন না, মৃত্যুর পর মনুমেণ্ট পাইবেন—ইহাও যেন কেমন কেমন ঠেকে। আর বর্ত্তমানের বিচার কার্য্যের ভার ভবিষ্যতের উপর হইলে, যেন কেমন একটু অস্বাভাবিক হয়। তবে সকল কাজেরই একটা সময় ও

সীমা আছে। সময় ও সীমা অতিক্রম করাই দূষণীয়। বর্ত্তমান বর্ত্তমানের বিচার করে,—বিধি নিষেধ মানে না বিচার বলিয়া অনেক সময়ে অবিচার করে বটে কিন্তু তাহা টিকে না। সর্ব্বথা বিচারই বাঞ্ছনীয়; অবিচারই বর্জ্জনীয়। বিচারে ব্যভিচার হইলেই অপকার ঘটে। বিচারে ব্যভিচার ঘটে বলিয়া অবশ্য উপরোক্ত বিধি। কিন্তু উহা মনুষ্য প্রকৃতির কলঙ্কমূলক বটে। কলঙ্ক-মাত্রেরই স্খালন, অন্তত তাহার চেষ্টা প্রয়োজন। চেষ্টা ভিন্ন কোনও উন্নতি সম্ভবে না। মনুষ্য প্রকৃতির বর্ত্তমান অপূর্ণতা জনিত আদর্শ উন্নতি বহুদূর স্থিত হইতে পারে। তজ্জন্য অনুশীলন অনাবশ্যক নয়,—বিশেষ আবশ্যক বটে। তবে যদি বল মনুষ্য প্রকৃতি স্বভাবতই অপূর্ণ এবং তজ্জন্য আদর্শ উন্নতি অসম্ভব—সে স্বতন্ত্র কথা। আর সে কথা ধরিলে ধর্ম্মমাত্রেই বিশেষত উচ্চতর ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে হয়।

প্রতিভা চিনিয়া লওয়া কঠিন বটে কিন্তু প্রতিভা অতি সুস্পষ্ট পদার্থ। অস্পষ্ট হইতে সুস্পষ্ট বাছিয়া বাহির করা—তবে কঠিন কেন? কঠিন এই জন্য,—যে সংসারে মেকি চলন আছে; পরন্তু একালে গিল্‌টীর কাজের বিলক্ষণ আধিপত্যও বটে। গিল্‌টীরও উপ-

কারিতা থাকিতে পারে কিন্তু গিল্টী বলিয়া পিত্তল সোণা নয়। গিল্টী গিল্টী—সোণা সোণা অথচ গিল্টী করা পিত্তলে ও সোণায় অনেক সময় প্রভেদ বুঝা যায় না। প্রভেদ বুঝিতে ধীরতার সহিত পরক পরীক্ষা করিতে হয়। গিল্টী হইতে সোণা বাছিয়া লওয়ার যে নিয়ম, শিক্ষা-মাত্র-সম্মার্জ্জিত লোক হইতে প্রতিভা চিনিয়া লওয়ারও সেই নিয়ম সোণাতে গিল্টীতে যে তফাৎ, প্রতিভায়—শিক্ষায়ও প্রায় সেই প্রভেদ। গিল্টী কথা এস্থলে অপকৃষ্ট অর্থে ব্যবহৃত নয়, তথাচ একটু সাবধানে গ্রহণ করা আবশ্যক। সোণায় গিল্টী সম্ভবে না, প্রয়োজন হয় না। প্রতিভায় শিক্ষা সম্ভবে, প্রয়োজন হয়। খনি হইতে উত্তোলন করিয়া স্বর্ণকে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা পরিষ্কার করত ব্যবহারোপযোগী করিতে হয়। প্রতিভার পক্ষে শিক্ষা সেইরূপ।

স্বর্ণে চিক-চৌদানি বাউটী-বাজু নানা অলঙ্কার। স্বর্ণ একুশ টাকা দরের—আঠার টাকা দরের,—চৌদ্দ টাকার দরের। স্বর্ণের অল্প খাদ—অধিক খাদ,—খাদ শূন্যত্বও আছে। ভিন্ন অলঙ্কারে গঠিত, ভিন্ন দরে বিক্রিত, খাদে অখাদে স্বর্ণ বটে। কার্য্য ভেদ পরিমাণ ভেদ, শক্তির ন্যূনাধিক্য ও ভিন্ন প্রকৃতিত্ব স্বত্ত্বে

প্রতিভাও মূলত এক পদার্থ। স্বর্ণের খাদাধিক্যের ন্যায়, শিক্ষিতের ভ্রমের ন্যায়, প্রতিভারও প্রমাদ আছে। প্রতিভার প্রমাদ ভয়ানক বটে কেন না তদ্দ্বারা অনিষ্ট অধিক। কিন্তু প্রমাদ স্বত্ত্বেও প্রতিভা—প্রতিভা। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারি যুগেই এক পদার্থ। কেবল ভিন্ন মূর্ত্তি ও স্ফূর্ত্তি—আর স্ফূর্ত্তির ন্যূনাধিক্য মাত্র। সাধারণে বিশেষত্ব, বিশেষে সাধারণত্ব, অচিন্তার মাঝখানে চিন্তা, দাসত্বের বাজারে স্বাধীন বাণিজ্য,—প্রতিভার পথ স্বতন্ত্র আর স্বখোদিত। অগ্নি ও উদ্দীপনা প্রধান লক্ষণ, অনুভূতিই সর্ব্বস্ব ধন। সে অনুভূতি এত গভীর, যে তাহাতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ডুবিয়াও স্থান থাকে;—তাহা এত পূর্ণ প্রখর আর প্রবল যে স্বতঃ উচ্ছ্বসিত হইয়া অন্যকে অনুভব করায়। প্রতিভার পূর্ণ আগুণে জল জ্বলে। জল জ্বলে যে প্রতিভায়,—তাহা মহাপুরুষের। মহাপুরুষ একালে বিরল। একাল প্রতিভার জমাটভাবের কাল বলিয়া বোধ হয় না। এ কালে প্রতিভার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা জগৎ বক্ষে বিক্ষিপ্ত। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার অংশ বিশেষের অণু পরমাণুর যিনি ভাগ্যবান অধিকারী, তিনি যাহা স্পর্শ করেন, উত্তপ্ত হইয়া উঠে—তাহা তীরবৎ

অন্যের হৃদয় স্পর্শ করিবার জন্য ছুটে। সমাজের একটা প্রশ্ন—সাহিত্যের একটা কথা,—সংসারের একটা ঘটনা, হৃদয়ের একটা বেগ, মনের একটা চিন্তা, কল্পনার একটা ঢেউ,—যাহাই হউক না, প্রতিভা কর্ত্তৃক যখনই ধৃত, তখনই তাহার ভিন্ন মূর্ত্তি, তখনি তাহার এক জন্মের পর, পুনর্জন্ম—নবপ্রফুল্লতা। ধর্ম্ম কর্ম্মের সহিত সাহিত্য ও সমাজের সহিত সর্ব্বত্র ও সকল সময়ে অতি নিকট সম্বন্ধ। আমাদের এ প্রস্তাব ধর্ম্ম ও সাহিত্য লইয়া এজন্য প্রতিভা বিষয়ক উপরোক্ত বিচারের অবতারণা। কিন্তু বলিব না বলিব না করিয়াও কিছু অধিক বলা হইয়াছে।

এ কালে অধঃপাতিত বঙ্গভূমে প্রতিভার এক আধ কণা পতিত না হইয়াছে, এমত নয়। কিন্তু শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি; বিশেষত এ দেশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত। এদেশে প্রতিভা পরিবর্দ্ধিত হইয়া সুফল প্রসূ হওয়ার অনেক অন্তরায়। বঙ্গে যে এক আধ কণা প্রতিভা স্বাভাবিক নিয়মানুক্রমে পতিত হইয়াছে, তাহার সম্যক্ আলোচনা করিবার ঠিক সময় এখনও হয় নাই। পরন্তু সকল কথা ও সকলের কথা বলিবার স্থানও ইহা নয়। তবে ধর্ম্ম ও সাহিত্য ঘটিত দুই একটি কথার কথঞ্চিৎ

সমালোচনা করা নাকি এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাই অস্মদ্দেশের অদ্যকার সাহিত্য ও ধর্ম্মান্দোলনে যে দুই ব্যক্তির মানসিক শক্তি বিশেষরূপে অঙ্কিত ও প্রগাঢ়রূপে প্রতিভাত,—যে দুই ব্যক্তির উদ্দীপনা দ্বারা অদ্যকার ধর্ম্মান্দোলন ও সাহিত্যানুশীলন উভয়ই উত্তপ্ত—তাঁহাদের সম্বন্ধে দুই এক কথার উল্লেখ করা কার্য্যতই প্রয়োজন। ইহাঁদের একজন কেশবচন্দ্র সেন—অপর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইহাঁদের একজন ধর্ম্মে, অপর সাহিত্যে। বঙ্গ সাহিত্যের অদ্যকার জীবনীশক্তি বঙ্কিমের উদ্দীপনা জনিত। আর অদ্যকার ধর্ম্মান্দোলনের ক্ষীপ্রবেগ যে দিকেই প্রবল হউক, ইহার অব্যবহিত কারণ কেশবের অগ্নিময়ী বাগ্মিতা ও অনুপম ধর্ম্মজীবন। কেশব ও বঙ্কিমের নাম একত্রে করিলে কেশবের কোন কোন শিষ্য শুনিয়াছি নাকি বিরক্ত হন। কিন্তু সে বিরক্তি ভ্রমজনিত, বোধ হয়। কেশবে বঙ্কিমে পার্থক্য, প্রতিভার বিশেষ ও সাধারণ ন্যূনাধিক্য আছে, থাকিতে পারে। কেশবে বঙ্কিমে প্রকৃতি গত ভিন্নতা, জীবনগত প্রভেদ অনেক আছে থাকিতে পারে। থাকা স্বাভাবিক এবং উহা থাকিবাতেই উভয়ের প্রতিভার পারস্পারিক সম্বন্ধ ও

সৌন্দর্য্য বৈচিত্র অতি রমণীয়। পার্থক্যে সাদৃশ্য—সাদৃশ্যে পার্থক্য—ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। এই নিয়ম নানা মূর্ত্তিতে সপ্রকাশ। আমরা না বুঝিয়া গোল করি।

কেশবের তীরোভাবের পরেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বঙ্কিমের ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ। ইত্যাগ্রেও তিনি ধর্ম্মনীতি প্রচার করিতেছিলেন বটে, কিন্তু সে স্বতন্ত্র পথে দাঁড়াইয়া। কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের অব্যবহিত পরেই বঙ্কিমচন্দ্র 'হাতেকলমে' ধর্ম্মপ্রচারক। এই ঘটনা কিছু বিচিত্র বটে। কিন্তু স্বাভাবিক।

কেশব যাহা অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছেন বঙ্কিম যে তাহাই সম্পূর্ণ করিতে বসিয়াছেন, তাহা নয়। তবে কেশবের জীবনব্রতের কার্য্যে বঙ্কিম আর একদিক দিয়া হাত দিয়াছেন, একথা বলা যাইতে পারে। কেশবের পরেই বঙ্কিমের ধর্ম্ম প্রচারক্ষেত্রে আবির্ভাব—একটু আশ্চর্য্য ঘটনা বটে, কিন্তু তাহার সম্যক তত্ত্বানুসন্ধান করার স্থান ইহা নয়। এস্থলে কেবল এই একটা কথা—এটা বঙ্কিম বাবুর নিজেরই কথা,—যে যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় একান্ত দিশাহারা, যাঁহারা ধর্ম্ম মানেন না, পরকাল মানেন না, প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম বুঝান— উক্ত মহাশয়ের ধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ উদ্দেশ্য। বঙ্কিম বাবু নিজে পাশ্চাত্য শিক্ষার 'সু''কু' দুই পিঠেরই আঠ পিঠ দেখিয়াছেন। জীবন স্রোতের জোয়ারে ও ভাটায় পড়িয়া হাতে কলমে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। কেশবের প্রতিভা স্বাভাবিক পবিত্রতার সহিত সংমিলিত ছিল। বঙ্কিমের প্রতিভা বিবিধ অভিজ্ঞতা ও বহুবর্ষপ্রসূ পরিপক্কতার সহিত সম্প্রতি সংযোজিত। অতএব এইমাত্র তাঁহার যে কার্য্যের উল্লেখ করিতেছিলাম, তাহা তাঁহারই যোগ্য বটে। পাশ্চাত্য-শিক্ষা-প্রপীড়িত, বেকন-বিলোড়িত-মস্তিস্ক, এপিকিউরস শিষ্যদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে,—তিনিই অধিকতর সমর্থ, বিধিমত প্রকারে উপযুক্ত। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তর স্পর্শ করিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তি বিশেষের স্বভাবতই আবশ্যক হয়। কেশবের প্রজ্বলিত প্রতিভাগ্নি দ্বারাও সমাজের যে স্তর পরিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প ছিল, বঙ্কিমের সাদামাটা দুই চারিটা ধর্ম্ম প্রবন্ধ দ্বারা সে স্তরের সংস্কার কার্য্য সমাধা হইবে—হইতেছে। দৃষ্টান্ত হাতে হাতেই আছে। কয়েক মাস মাত্র পূর্ব্বে বঙ্গ সাহিত্যের বেল মল্লিকা গোলাপ চামে-

লীতেও নাস্তিকতা, সন্দেহবাদের দুর্গন্ধ পাওয়া যাইত। কিন্তু আজ সেই সব সুন্দর ফুল হইতে হরিনামের সুমিষ্ট সৌরভ ছুটিতেছে। এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন বঙ্কিমের ইঙ্গিত মাত্রেই সংঘটিত হইয়াছে। অতএব এ ক্ষেত্রে বঙ্কিম,—কেশবের নিজের কাজই করিয়া দিতেছেন।

এ স্থলে কিন্তু বলা আবশ্যক যে তাঁহার ইদানীন্তন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য বঙ্কিম বাবুর প্রতিভার সমাহ্বান আমরা অদ্য করিতেছি না। ধর্ম্মোপদেষ্টারূপে এ পর্য্যন্ত তিনি অতি অল্প কথাই বলিয়াছেন। সে সব কথা উচ্চ অঙ্গের বটে কিন্তু তজ্জন্য উপরের অত কথা আমরা বলি নাই ইহা বোধ হয় বুদ্ধিমানকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। এ সব কথা আপাতত এই পর্য্যন্ত।

প্রস্তাবের আরম্ভেই বঙ্কিম বাবুর ধর্ম্ম ব্যাখ্যার কথা বলিতেছিলাম। আর একটু বলিয়া সে কথাটা শেষ করি। উক্ত ধর্ম্ম ব্যাখ্যা পুরাতন বটে কিন্তু অতি পরিষ্কার। ধর্ম্ম—শাস্ত্রাত্মক বটে কিন্তু প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান সম্মত। পাশ্চাত্য প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানের অদ্যকার প্রধান প্রশ্ন—সামঞ্জস্য।

নব বিধানাচার্য্যের নব বিধানের অবতারণা সামাঞ্জস্য ও সমন্বয়ের জন্য। বঙ্কিম বাবুর ধর্ম্ম ব্যাখ্যাতেও সামঞ্জস্যের কথা। ভিন্ন ভিন্ন দিকে ভিন্ন ভিন্ন সুরে একই সঙ্গীত, আর সে গীতের একই অর্থ। ফলত ধর্ম্মের ভাব বড়ই বিশ্বোদর।

---

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

## সাহিত্য।

সাহিত্য অর্থ কি?—সংকীর্ণ ও বিস্তীর্ণ অর্থ; সাহিত্যের দেশীয় ও বিদেশীয় অর্থের তুলনা। ভাষা ও সাহিত্যে প্রভেদ কি? সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ, উহার উচ্চতর অর্থ। সাহিত্য ও সংসার ও মনুষ্যত্ব। আর্য্য সাহিত্যের ভগ্নাবশেষ আধুনিক হিন্দু জাতির একমাত্র গৌরব স্থল। সাহিত্য ও জাতীয় বিকাশ;—বান্ধব সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ। ধর্ম্মানুশীলনে সাহিত্যানুশীলনের আবশ্যক,—তাহার যুক্তি ও কারণ পরম্পরা।

অতঃপর সাহিত্য সম্বন্ধে গুটী দুই চারি কথা।

ধর্ম্মের ন্যায় সাহিত্য শব্দের অর্থও অতি প্রশস্ত। কিন্তু কথাটার সম্পূর্ণ অর্থ প্রায়ই বড় কেহ গ্রহণ করে

না। অপেক্ষাকৃত অপূর্ণ ও সংকীর্ণ অর্থে কথাটা বলা ও বুঝা হয়। সাহিত্য বলিতে সাধারণত লোকে উহার অংশ মাত্র বুঝে আর সেই অংশ বিশেষ বুঝাইবার জন্যই কথাটা এখন চলিত। বাঙ্গালা ভাষার অভিধান খুলিয়া দেখি সাহিত্য মানে কি? সাহিত্য শব্দে— "সংসর্গ, মিল, কাব্য শাস্ত্র" ইত্যাদি। সাহিত্য বলিতে লোকে 'সংসর্গ, মিলন' বুঝুক আর না বুঝুক—কাব্য শাস্ত্রটা অগ্রেই বুঝিয়া লয়। সাহিত্য শব্দ উচ্চারিত হইতে শুনিলেই নাটক নবেল কাব্য কবিতা উপন্যাস পরিহাসই মনে পড়ে। ফলত সাহিত্য অর্থে আমরা মোটের উপর সুকুমার সাহিত্যই বুঝি। ইংরেজী ভাষায়ও অনেক স্থলে কথাটা ঐরূপ বুঝায়। Literature শব্দের অন্যতম অর্থ—এইটীই প্রধান অর্থ—Belles letter সুকুমার সাহিত্য অর্থাৎ যে রচনা রসময়ী ভাবময়ী ও লাবণ্যময়ী তাহাই সাহিত্য। কিন্তু ইংরেজী ভাষায় Literature শব্দের খুব প্রশস্ত অর্থও আছে এবং সে অর্থও বিলক্ষণ প্রচলিত ও বহুলরূপে ব্যবহৃত। গণিত ভিন্ন আর আর রচনা মাত্রই ইংরেজী ভাষায় Literature শব্দের বাচ্য—যেমন Literature of the Rent Bill ইত্যাদি। ফলত সাহিত্য শব্দের ব্যবহারে শ্বেতাঙ্গগণ আমাদের

অপেক্ষা উদার বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা ধর্ম্ম শব্দের লেজ়া মুড়া বাদ দিয়া অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া যেরূপ Religion বুঝেন, সাহিত্য কথাটা সম্বন্ধে আমরাও প্রায় তদ্রূপ করি। সমগ্র ও সাধারণের স্থলে শ্রেণী মাত্র বুঝি, কথাটার ভিতরে বড় অধিক প্রবেশ করি না।

সহিত+ষ্ণ=সাহিত্য। শব্দশক্তির সহিত চিন্তা-শক্তির সংযোগকেই সাহিত্য বলি। শ্রুতিস্মৃতি উভয়ই সাহিত্য বটে। ভাষা ও সাহিত্যে প্রভেদ এই যে সাহিত্য ভাষার সারভাগ ও চিরজীবী। সাহিত্য বলিতে বিস্তর বুঝায়। বেদবেদান্তাদি ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে কপিল কণাদাদি প্রবর্ত্তিত তত্ত্ব বিদ্যা, ব্যাস বাল্মীকি কালিদাসাদির কাব্য গ্রন্থ হইতে, সামান্য শকট চালকের গ্রাম্য গীতি ইহার মধ্যে যাহা কিছু সকলকেই সাহিত্য বলি। পঞ্চদশীও সাহিত্য, পঞ্চানন্দও সাহিত্য। পুলস্ত্যের আমলের পুরাণ 'পুথি' আর আজিকার ইংরেজী ছাপার নব-নলিনী সম্বাদ উভয়ই সাহিত্য বটে। কর্ম্ম-শাস্ত্র ধর্ম্ম-শাস্ত্র যোগ-শাস্ত্র বিয়োগ-শাস্ত্র কাব্য-কবিতা গণিত-জ্যোতিষ সকলই মোটের উপর সাহিত্যেরই অধিকারাধীন। ভাগ-বিভাগ শ্রেণী,

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি ভেদে সাহিত্যেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রযুক্ত হয়।

পরন্তু সাহিত্যের সর্ব্বোচ্চ সারাদপি সার একটী অর্থ হইতে পারে—সে অর্থ পরম রমণীয় ধর্ম্মগত—সর্ব্ব ধর্ম্মের সার লক্ষ্য—নারায়ণের সহ নরের সাযুজ্য—সাক্ষাৎ সংমিলন অর্থে সাহিত্য। তাহাই প্রকৃত সাহিত্য-তখনই প্রকৃত সাহিত্য—যদ্দারা ও যখন আত্মা পরমাত্মা গত হয়—পিতার সহিত পুত্রের সাক্ষাৎ হয়। ইহাই সাহিত্যের আধ্যাত্মিক উচ্চতম অর্থ বটে।

ভৌতিক অর্থে সাহিত্যেই সংসার। সাহিত্যেই মানুষের মনুষ্যত্ব। সংসারের প্রথম বন্ধন যদি হয় মায়া,—দ্বিতীয় বন্ধন সাহিত্য। সাহিত্য ভিন্ন সংসার চলে না; সমাজ সংগঠিত হয় না—সভ্যতার সৃষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি হয় না। সংসারের সকল বিভাগ—সকল কার্য্যে—সকল সম্বন্ধে, সর্ব্বত্রই সাহিত্য চাই। ভৌতিক আধ্যাত্মিক উভয় অর্থেই সাহিত্য চাই। প্রথমত মনুষ্যে মনুষ্যে সাহিত্য অর্থাৎ সংযোগ দ্বিতীয়ত উক্ত সংযোগ সংসাধন ও স্থায়ী করণার্থে—সাধারণত যাহাকে সাহিত্য বলে তাহা চাই। ধর্ম্ম প্রচার করিবে, সাহিত্য চাই—জ্ঞান বিস্তার করিবে, সাহিত্য চাই। ধর্ম্ম ভিন্ন জগতে

মনুষ্যের অস্তিত্ব সম্ভবে না। ধর্ম্ম শিক্ষা সাপেক্ষ। শিক্ষা, সাহিত্য সাপেক্ষ। সাহিত্যই লোক শিক্ষার একমাত্র উপায়। সাহিত্য মনুষ্য জাতির সর্ব্বোচ্চতম গৌরব। সাহিত্যেই জাতীয়তা ও সভ্যতা,—সাহিত্যই মনুষ্যের উন্নতি অবনতির জীবন্ত জাগ্রত সাক্ষী। যাহাদের সাহিত্য নাই—তাহাদের মনুষ্য নামের উপযুক্ত কিছুই নাই; তাহারা বন্য পশু হইতে অধিক উর্দ্ধে আজিও উঠিতে সমর্থ হয় নাই। হিন্দুজাতির রাজ্য ধন শক্তি সম্ভ্রম সকলই গিয়াছে—কিছুই নাই—আছে কেবল তাহাদের অনুচ্চ অপূর্ব্ব সাহিত্য সৌধের কথঞ্চিৎ ভগ্নাবশেষ। এই কথঞ্চিৎ ভগ্নাবশেষ নিতান্ত ম্লান ভাবাপন্ন বিচ্ছিন্ন, বহু স্থান-বিন্যস্ত ও বিশৃঙ্খলা যুক্ত; কিন্তু তবুও কেবল ইহারই জন্য, বিলুপ্ত প্রায় হিন্দু সাহিত্যের এই যৎসামান্য ভগ্নাবশেষের জন্যই হিন্দু মনুষ্য নামে অভিহিত হইতেছে। নতুবা দুর্ভাগ্যের যে দশম দশায় হিন্দু আজি উপস্থিত কে তাহাকে মনুষ্য বলিত? কে তাহাকে প্রভূত মানসিক বল সম্পন্ন, সিংহ পরাক্রমশালী হিন্দুজাতির বংশধর বলিয়া স্বীকার করিত? তাহার সাহিত্যের জন্যই হিন্দু আজিও ধরাপৃষ্ঠে টিকিয়া আছে। ষোলআনার একআনাও

নাই ;—এক আধকণা আছে—কিন্তু তাহা হইতেই,—সাহিত্যের সেই সামান্য ভগ্নাংশ হইতেই হিন্দুজাতির মাহাত্ম্য জগৎ অনেকটা বুঝিতে পারিতেছে।

মানুষের গতি-মতি-রতি-প্রীতি, উন্নতি অবনতি, কল্পনা কামনা, যাহা কিছু সমস্তই—সাহিত্যে—সপ্রকাশ; মনুষ্য জাতির জাতীয় বিকাশ স্তরে স্তরে অঙ্কিত। সাহিত্যে মনুষ্য জীবন অক্ষরে অক্ষরে খোদিত।

কিন্তু এ স্থানে—আমাদের নিজের কথা না বলিয়া, অন্যের লিখিত কথা উদ্ধৃত করিলে উপস্থিত প্রাসঙ্গিক কথাটা সৌষ্ঠবান্বিত করিয়া বলা হইবে। বান্ধব সম্পাদক ঘোষজ মহাশয়কে অনেকে আদর করিয়া এমারসণ বলিয়া থাকেন। তিনি তত্তুল্য কিনা তাহা জানি না। তবে যে তিনি এ কালের বাঙ্গালী দুর্লভ চিন্তাশীলতার অধিকারী ইহা জানি। কেই বা না জানে? প্রস্তাবের এ অংশ উক্ত ঘোষজ মহাশয়ের ওজস্বিনী ভাষায় বর্ণিত করিতেছি ;—

সাহিত্য জাতীয় হৃদয়ের আদর্শ,—জাতীয় হৃদয়ের ইতিহাস। যে জাতির হৃদয় যে সময়ে যে ভাবে পরিপূর্ণ কি পরিপ্লুত থাকে সেই জাতির সেই সময়ের

সাহিত্যও সেই ভাবে সম্পূর্ণরূপে বিলাসিত রহে। মনুষ্যের মন যখন শোকে আকুল, ক্রোধে উদ্দীপ্ত, অথবা দুঃখে কি দুশ্চিন্তায় অবসন্ন রহে, তাহার মুখচ্ছবি তখন তমসাচ্ছন্ন এবং কণ্ঠধ্বনি বিকৃত হয়,—এবং যখন তাহার হৃদয় আনন্দভরে নৃত্য করে, চিত্ত নূতন সুখের সুধাময় স্পর্শে প্রফুল্ল হইয়া উঠে, তাহার চক্ষু তখন সেই আনন্দও সেই সুখে হাসিতে থাকে, তাহার কণ্ঠস্বর বসন্ত-মদ-মত্ত কোকিল কণ্ঠের মাধুরীতে মিশিয়া যায়। মনুষ্য সম্বন্ধে প্রকৃতির এই নিয়ম অলঙ্ঘনীয়, এবং জাতীয় সাহিত্যও সর্ব্ব প্রকারে এই নিয়মের অধীন। উহাতে কখনও ক্রোধের ভয়ঙ্কর গর্জ্জন কখনও অবরুদ্ধ ক্রোধের ততোধিক ভয়ঙ্কর স্তম্ভিত ভাব। কখনও প্রেমের উচ্ছ্বাস, কখনও শোক ও পরিতাপের হৃদয় বিদারী করুণা নিস্বন, কখনও ধীর গর্ব্ব ও বাহু বল দর্পের সিংহ নাদ, কখনও স্বার্থপরতা ও বণিগ্বৃত্তির সংকোচ ও সাবধানতা। কখনও বিলাসের আলস্য ও আবেশ, কখনও ভয়ের বিকৃত ভঙ্গি এবং বীভৎস বিকার। * * * সাহিত্য পরিমার্জ্জিত দর্পণের ন্যায় জাতীয় পরিবর্ত্তনের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বর্ণ ভেদও আমাদিগের সম্মুখে আনিয়া প্রদর্শন করে।

## সাহিত্য ও জাতীয়বিকাশ *

বলা বাহুল্য যে মনই প্রকৃত মানুষ। মনুষ্যত্ব লাভ কল্পে মানুষ কি, তাহা জানা চাই। মানুষ কি জানিতে হইলে তাহার মনের খাটী খবর জানা আবশ্যক। এ খবর কেবল মাত্র সাহিত্যতেই প্রাপ্তব্য। অতএব ধর্ম্মানুশীলন কল্পে সাহিত্যানুশীলন অবশ্যম্ভাবী। মোটের উপর ধরিলে সাহিত্যানুশীলন ধর্ম্মানুশীলনেরই নামান্তর। সাহিত্য ধর্ম্মের

---

* বাঙ্গালা লিখিতে বসিয়া, সহযোগী বাঙ্গালী বাঙ্গালা লেখকের কোন কথার প্রসঙ্গ করা অনেকে পাপ মনে করেন। অনেকে উহাকে মূর্খতার পরিচায়ক ও আত্ম-শ্লাঘার পীড়াদায়ক বিবেচনা করিয়া উহা হইতে বিরত হন। এবং উক্ত পাপে কেহ লিপ্ত হইলে তাহাতে যথেষ্ট বিরক্ত হইয়া থাকেন। 'বাঙ্গালী লেখক উপরন্তু সহযোগী লেখক, এমন কি রাবণ কুম্ভকর্ণ যে তাহার কথা গ্রাহ্য করিতে হইবে, বা তাহার কথা উদ্ধৃত করিতে হইবে।' অবশ্য যাঁহারা পণ্ডিত ও প্রতিভার বরপুত্র তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র তাঁহারা উক্ত মহা পাপে লিপ্ত হইবেন কেন? কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত আমরা উহার কিছুই নহি। আমরা মূর্খাদপি মূর্খ। অথচ রীতিমত আত্মশ্লাঘাটুকুও আছে আর আত্মশ্লাঘাটুকু কোনরূপে প্রপীড়িত করি এমত বাসনাও রাখি না। ফল কথা এই যে উপরোক্ত কার্য্যটায় আমাদের আত্মশ্লাঘা উত্তেজিত ও বর্দ্ধিতই হয়, কোন প্রকারে প্রপীড়িত বা সঙ্কোচিত হয় না। পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক যে কালেরই হউন বাঙ্গালী বাঙ্গালা লেখকের কথা সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের আদরণীয়। সংস্কৃত বচন প্রমাণও আমাদের নিকট তত আদরণীয় নয়।

বহির্ভূত নহে—অন্তর্ভূত ও অঙ্গীভূত। সাহিত্যের আলোচনায় ধর্ম্মেরই আলোচনা করা হয়। যদি বল সাহিত্যের আলোচনার অনেক স্থলে ধর্ম্মের অনুশীলন হয় না, তাহার উত্তর এই যে ধর্ম্মের আলোচনাতেও অনেক স্থলে ধর্ম্মের অনুশীলন হয় না। চালন-দণ্ড পরমান্ন-পিষ্টকে নিয়ত নিমজ্জিত থাকিয়াও উহাদের মধুর আস্বাদ গ্রহণে সমর্থ হয় না। অনেক ধর্ম্ম-শাস্ত্রজ্ঞ ধর্ম্ম-যাজক ধার্ম্মিক নয়, ইহা বহু পুরাতন কথা। ধর্ম্ম-শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও ধার্ম্মিক না হইবার প্রকৃত কারণ ধর্ম্মতত্ত্বানুভূতির অভাব। যে কার্য্যকারণ পরম্পরা হেতু ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞতা, ধর্ম্মতত্ত্বানুভূতি ও ধার্ম্মিকতা বিরহিত হইতে পারে—সেই কার্য্যকারণ পরম্পরা হেতু সাহিত্যজীবী বা সাহিত্যক্ষেত্র ভ্রমণশীল ব্যক্তির ধর্ম্মে উদাসীন হওয়া সম্ভবে। এই কার্য্যকারণ পরম্পরার তত্ত্বানুসন্ধান ও বিচারে প্রবৃত্ত হইতে আপাতত আমরা প্রস্তুত নহি এবং উহা এ প্রস্তাবের বিশেষ উদ্দেশ্যও নহে। ফলত আলোচনা ও অনুশীলন ভেদে আসক্তি এবং আনুরক্তির উৎকর্ষাপকর্ষ ঘটে। সাহিত্যেও ঘটে, ধর্ম্মেও ঘটে।

---

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

## সাহিত্যালোচনা ।

সাহিত্যালোচনার শ্রেণীবিভাগ;—উচ্চ, মধ্য ও নিম্নশ্রেণী; সাহিত্যালোচনার স্বাস্থ্যকর পরিণাম প্রফুল্ল ধর্ম্ম-জীবন। সাহিত্যের সহিত ধর্ম্মের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সাহিত্যের দ্বারা ধর্ম্ম কি পরিমাণে অগ্রসর হয়,—সুকুমার সাহিত্য,—'প্রচারে' প্রকাশিত ধর্ম্ম ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধের সমালোচনা;—সাহিত্যের নিম্ন ও উচ্চ সোপান; সুকুমার সাহিত্যের আলোচ্য বিষয়—'ভক্তি প্রীতি শান্তি' পবিত্র ধর্ম্ম—রমণীয় কাব্য। ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকতা—জ্ঞান ও সাধনে পার্থক্য; কবিতা ধর্ম্মের কোমল ও মধুর অংশ,—দার্শনিক তত্ত্ব উহার কঠিন আবরণ,—সাহিত্যের পরমারাধ্যা দেবী কবিতা। ধর্ম্ম-জীবনের প্রারম্ভ কঠিন কর্কশ, উহার পরিণাম মধুর ও সুন্দর,—নব্যবঙ্গ হইতে দৃষ্টান্ত; "পৌত্ত-লিকতার" ন্যায় "একেশ্বরবাদও" সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম; অসম্প্রদায়িক ধর্ম্ম একমাত্র প্রেমগত ভেদমাত্র বিরহিত। রস-রতিবিহীন শুষ্ক তত্ত্বজ্ঞানে 'সিদ্ধি' কদাচিৎ সম্ভবে। বঙ্কিমবাবুর ব্যাখ্যাত "অনুশীলন" প্রণালী দ্বারা সাহিত্যগত ধর্ম্মের প্রমাণ।

সাহিত্যালোচনা সাধারণত তিনশ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। নিম্ন মধ্য ও উচ্চ। সাহিত্যের নিম্নশ্রেণীর আলোচনা করে—সাহিত্যব্যবসায়ী বা সাহিত্যজীবী স্বল্পমূল্য স্বার্থের জন্য। ইহারা 'মুদিখানা' বা 'মণিহারির' দোকান করিলেও করিতে পারে।

সরাপ ও সাহিত্যের কারবার উভয়ই ইহাদের নিকট তুল্য মূল্য। সংসারের স্বার্থ-সিদ্ধি বা আত্মাভিমানের শ্রীবৃদ্ধি করাই ইহাদের লক্ষ্য, তা যে বৃত্তি ব্যবসায়ের দ্বারা হউক না। সুবিধামত যেটা হউক একটা অবলম্বন করিলেই হইল। পরন্তু সাহিত্যের মধ্যশ্রেণীর আলোচনায় নিযুক্ত সৌন্দর্য্যাকাঙ্ক্ষী জ্ঞান পিপাসু সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি। ইনি সাহিত্যের জন্য সাহিত্যের সেবা করেন। ইহাঁর সাহিত্য তৃষ্ণা চির-প্রখরা। সাহিত্য হইতে পৃথক হইয়া জীবনধারণ করা একরূপ অসম্ভব। সাহিত্যের আলোচনা ও উপাসনা ইহাঁর স্বাভাবিক ব্রত;—জীবনের সর্ব্বোচ্চ সুখ-সংসারের অমৃত ময় উৎস। সাহিত্য ইহাঁর উপাস্য দেবতা। কোন ভক্ত কোন শাক্ত, কোন প্রেমিক কোন পৌত্তলিক—কেহই ইহাঁর অপেক্ষা, স্ব স্ব উপাস্য দেব দেবীর প্রতি অধিকতর অনুরক্ত নহেন।

তৃতীয় বা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য সেবক যাঁহারা তাঁহাদিগকে সাধু সন্ন্যাসী আখ্যা প্রদান করিলে শব্দের অপব্যবহার করা হইবে না। ইহাঁরাও সাহিত্যের জন্য সাহিত্যের সেবা করেন কিন্তু সে সাহিত্য অক্ষয় সারাদপি-সার অনন্ত সাহিত্য অনন্তদেবের সহিত।

পুস্তকের ও প্রকৃতির সাহিত্য ইহঁাদের সোপান স্বরূপ—স্বর্গের সাহিত্যলাভ করিবার জন্য এবং শেষোক্ত সাহিত্য-কেই লক্ষ্য করিয়া ইহঁারা প্রথমোক্ত সাহিত্যের সেবা করেন;—পার্থিব সাহিত্যের অপূর্ণতায় ভুলেন না। স্বর্গের সাহিত্যের পূর্ণ সৌন্দর্য্যানুভব ব্যতীত তৃপ্ত হয়েন না। এবং নিজে তৃপ্ত হইয়া ক্ষান্ত হয়েন না। অন্যের তৃপ্তির জন্য অনাসক্তভাবে লিপ্ত রহেন, কেননা ইহঁাদের তৃপ্তি অন্যের তৃপ্তি হইতে ভিন্ন হইতে পারে না। এ শ্রেণীর সাহিত্য-সেবক ভারতবর্ষে বিস্তর ছিলেন। আর্য্যঋষিদিগের মধ্যে অনেকে এ শ্রেণীর আদর্শ। বঙ্গসাহিত্যে কোন কোন বৈষ্ণব কবি ও আরও কেহ কেহ এই শ্রেণীভুক্ত।

নিম্নশ্রেণীর সাহিত্যালোচনা সম্বন্ধে এ প্রস্তাবে আমাদের বিশেষ কোন কথা নাই। অবস্থা গতিকে সাহিত্যের ইতর ব্যবসায়ী—নিম্নশ্রেণীর পেসাদারী লোকে প্রকৃত সাহিত্যানুরাগী হইলেও হইতে পারে। শুভ-যোগ উপস্থিত হইলে হওয়া অসম্ভব নহে।

পরন্তু মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যালোচনা লইয়া আমাদিগের অদ্যকার কথা। মধ্য শ্রেণীর সাহিত্যালোচনা বা সাহিত্যের জন্য সাহিত্যালোচনা

সংসারের উচ্চ আদর্শ। এই আদর্শ অনুসরণ করিবার জন্য লোকে লোককে পরামর্শ দেয়—শিক্ষক ছাত্রকে উপদেশ দেন। এ পরামর্শ—এ উপদেশ শিরোধার্য্য; এ আদর্শ অনুকরণীয়। সাহিত্যের জন্য সাহিত্যের আলোচনা জগতে প্রতিষ্ঠাপিত—গৌরবসম্পন্ন। এ প্রতিষ্ঠা এ গৌরব উপযুক্ত স্থলে নিক্ষিপ্ত বটে। কারণ দুইটী। এক কারণ এই যে সাহিত্য নিজেই মহদ্বস্তু। অপর কারণ উহা মহৎ হইতে মহত্তর গ্রামে মানবাত্মাকে উন্নত করে। ফল কথা এই যে মধ্য শ্রেণীর সাহিত্যালোচনায় যাঁহারা নিযুক্ত,—মানসিক ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে সাহিত্যালোচনার সর্ব্বোচ্চগ্রামে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ধর্ম্মানুরতিতে তাঁহাদের উপস্থিত হওয়াই স্বাভাবিক। কেন না Substance of all religion is culture আর সেই culture, literature অর্থাৎ সাহিত্য হইতে প্রধানত প্রাপ্তব্য। অদ্যকার বঙ্গ সাহিত্য হইতে দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা যথাস্থলে পশ্চাৎ পরিস্ফুট করিব।

আপাতত উদ্দিষ্ট ও আনুষঙ্গিক অন্য দুই একটা কথা। সমগ্র সাহিত্যের সহিত ধর্ম্মের অকাট্য ওতপ্রোত সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ স্তরে স্তরে শাখায় প্রশাখায়

বিশ্লেষ করিয়া দেখান এ প্রস্তাবের লক্ষ্যও নয়, আর তাহা আমার শক্তির অতীতও বটে। কিন্তু সাহিত্যের শ্রেণী বিশেষের দ্বারা ধর্ম্মানুরতির কিরূপ 'চলাচল' হয় তাহার কথঞ্চিৎ অনুসন্ধান করা এ প্রবন্ধের অন্যতম প্রধান অংশ। অতএব সেই অংশের অনুসরণ করত পূর্ব্বাবতরিত কথার সূত্র মিলাইয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

সাহিত্যের যে শ্রেণী বিশেষের উল্লেখ করিলাম তাহাই কিন্তু খাস সাহিত্য;—তাহাই সাধারণত সাহিত্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি ও পার্থক্য প্রভেদার্থ আমরা উহাকে সুমুকার সাহিত্য বলিতেছি। সুকুমার সাহিত্যের ধর্ম্মের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ এবং উহার স্বাস্থ্যকর আলোচনা দ্বারা আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের দিকে কি পরিমাণে অগ্রসর হওয়া সম্ভব, এই দুইটী কথা বুঝিতে ও বিশ্লেষ করিতে আমরা চেষ্টা করিব। কিন্তু সুকুমার সাহিত্যের সীমাও বিলক্ষণ বিস্তৃত। সমগ্র সীমা পরিমাপ করা অল্প কথায় অসম্ভব। অতএব সুবিধা মত, সুকুমার সাহিত্যের অংশ বিশেষ লইয়াই আমরা মূল প্রশ্নের বিচার করিব।

কিছু কাল হইল "প্রচার" পত্রে 'ধর্ম্ম এবং সাহিত্য'

শিরস্ক একটী প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। উহা অবলম্বন করিয়া আমরা আমাদিগের কথাটা উঠাইব। উল্লিখিত প্রস্তাবে সাহিত্য-প্রবন্ধ অপেক্ষা ধর্ম্ম প্রবন্ধের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনার্থে ধর্ম্ম ও সুকুমার সাহিত্য প্রসঙ্গে উপর উপর দুই একটী কথার আলোচনা আছে। উক্ত প্রবন্ধের লেখক কে ঠিক জানি না। যিনিই হউন, তিনি যে একজন নমস্য ব্যক্তি ইহা নিশ্চিত। তিনি ধর্ম্ম ও সাহিত্য, এতদুভয়ের পারস্পারিক সম্বন্ধ প্রসঙ্গে যে এক আধটী কথা বলিয়াছেন, মোট সমষ্টির উপর আমরা তাহারই অনুসরণ করিতেছি ও করিব। তবে উক্ত প্রবন্ধের অংশ বিশেষের সহিত আমাদের যদি একটু মত বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, তাহার নিম্নলিখিত দুইটী কারণের কোন একটী কারণ নিবন্ধন বুঝিতে হইবে। (১) হয় আমরা ধর্ম্ম ও সাহিত্যের প্রকৃত সম্বন্ধ ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। (২) নতুবা 'প্রচারের' প্রাগুক্ত প্রবন্ধ লেখক কথাটা অল্পের মধ্যে মোটামুটী বলিবার উদ্দেশে উহার সকল অংশ সূক্ষ্মরূপে বুঝাইবার আবশ্যকতা বিবেচনা করেন নাই। 'প্রচার' হইতে বক্ষ্যমান প্রবন্ধের কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া মূল ও আনুসঙ্গিক দুই কথাই পরিষ্কার করিতেছি ;—

"যিনি নাটক নবেল পড়িতে ভাল বাসেন তিনি একবার মনে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন কিসের আকাঙ্ক্ষায় তিনি নাটক নবেল পড়েন? যদি সেই সকলে যে বিস্ময়-কর ঘটনা আছে, তাহাতেই তাঁহার চিত্ত বিনোদন হয়, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, বিশ্বেশ্বরের এই বিশ্ব-সৃষ্টির অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার কোন্ সাহিত্যে কথিত হইয়াছে। একটী তৃণে বা মাছির পাখায় যত আশ্চর্য্য কৌশল আছে, কোন উপন্যাস লেখকের লেখায় তত কৌশল আছে কি? আর ইহার অপেক্ষা যাঁহারা উচ্চদরের পাঠক, যাঁহারা কবির সৃষ্ট সৌন্দর্য্যের লোভে সাহিত্যে অনুরক্ত, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বরের সৃষ্টি অপেক্ষা কোন কবির সৃষ্টি সুন্দর? বস্তুত কবির সৃষ্টি, সেই ঈশ্বরের সৃষ্টির অনুকারী বলিয়াই সুন্দর। নকল কখন আসলে সমান হইতে পারে না। ধর্ম্মের মোহিনী-মূর্ত্তির কাছে সাহিত্যের প্রভা বড় খাটো হইয়া যায়। * * * * সাহিত্যের আলোচনায় সুখ আছে বটে, কিন্তু যে সুখ তোমার উদ্দেশ্য ও প্রাপ্য হওয়া উচিত, সাহিত্যের সুখ তাহার ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। সাহিত্যও ধর্ম্ম ছাড়া নহে। কেন না সাহিত্য সত্য মূলক! যাহা সত্য তাহা ধর্ম্ম।

* * * সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিম্ন সোপান করিয়া ধর্ম্মের মঞ্চে আরোহণ কর।”

পুনশ্চ;—

“ধর্ম্মালোচনার যে অসীম অনির্ব্বচনীয় আনন্দ, তাহার উপভোগের জন্য যে ধর্ম্ম-মন্দিরের নিম্ন সোপানে যে কঠিন ও কর্কশ তত্ত্বগুলি বন্ধুর প্রস্তরের মত আছে সেগুলিকে আগে আয়ত্ত করা আবশ্যক।”

বলা বাহুল্য যে উপরি উদ্ধৃত সমস্ত কথাই প্রকৃত। ‘বিশ্বেশ্বরের এই বিশ্বসৃষ্টি অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার কোন সাহিত্যেই কথিত হয় নাই। হওয়া অসম্ভব। ‘ঈশ্বরের সৃষ্টির অপেক্ষা কোন কবির সৃষ্টি সুন্দর’ নয়। সুন্দর হইতে পারে না। বিশ্বপতির বিশ্ব সৃষ্টিতে যে অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য, অতুল বিস্ময়কারিতা তাহার পরমাণুর পরমাণুও কোনও মনুষ্যকৃত সাহিত্যে নাই, কখনও থাকিবে না। তবে সেই অনন্ত সৌন্দর্য্য বিপুল বিস্ময়কারিতা মনুষ্য যত টুকু উপলব্ধি এ পর্য্যন্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার আলেখ্যই কেবল সাহিত্যেই আছে। সাহিত্য আর কিছুই নয়,—ধর্ম্মে কর্ম্মে জ্ঞানে বিজ্ঞানে—সাধন ভজনে অনুষ্ঠানে,—ভক্তি প্রীতি-প্রেমে শান্তি সৌন্দর্য্যে—মানুষ এ জগতে আসিয়া যত-

টুকু উন্নত বা অবনত হইয়াছে,—উহাদের দিকে যে পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছে, বা উহাদের হইতে যতটা পশ্চাতে পড়িয়াছে,সাহিত্য তাহারই একখানা চিত্র,—তাহারই একটা নিকাশী জমা খরচ। এ চিত্রে রঙ্ মাত্রই আছে; এ জমা খরচে মনুষ্য জগতের পাই পয়সাটীরও ছাড় নাই,—ক্রান্তি দন্তিরও হিসাব আছে। যিনি যে পথের পথিকই হউন,—অগ্রে পশ্চাতে, উভয় পার্শ্বে—সাহিত্য পথ দেখাইয়া চলিয়াছে এবং চলিতে চলিতে নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিসর বৃদ্ধি করিতেছে। সাংসারিক অর্থই চাও, বা পরমার্থ তত্ত্বই খোঁজ, মনুষ্যত্বের যে মঞ্চেই আরোহণ করিতেই অভিলাষ কর, সাহিত্যকে ছাড়িতে পার না। মনুষ্য জীবনে সাহিত্য সর্ব্বেসর্ব্বা নয়, কিন্তু সর্ব্ব বিষয়ের পথ প্রদর্শক বটে। সাহিত্যানুশীলন ধর্ম্মের অপরিহার্য্য উপায়।

"ধর্ম্ম মন্দিরের নিম্ন সোপানে যে সকল কঠিন ও কর্কশ তত্ত্ব গুলি বন্ধুর প্রস্তরের মত আছে সে গুলিকে" আয়ত্ত করিতে ধর্ম্ম-বিষয়ক কটমট প্রবন্ধের আবশ্যক। এই কটমট প্রবন্ধও কিন্তু সাহিত্য। প্রচারের লেখক অতি উত্তমই বলিয়াছেন যে এ সাহিত্য, ধর্ম্ম-মঞ্চের নিম্ন সোপানে স্থিত। মঞ্চে উঠিতে নিম্ন সোপানা-

বলীর ন্যায় উচ্চতর সোপান নিচয়ও পর্য্যটন করা প্রয়োজন। নিম্ন সোপানস্থ তত্ত্ব সকল কর্কশ ও বন্ধুর বটে কিন্তু উচ্চতর সোপান নিচয় কুসুম শরীর সন্নিভ সুমধুর *। নিম্ন ও উচ্চ ধর্ম্মের উভয়বিধ সোপানই এক সূত্রে সাহিত্যে গাঁথা। ধর্ম্মের নিম্ন-সোপানে যে সাহিত্যের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহা নীরস শুষ্ক ও কর্কশ হইতে পারে, কিন্তু তাহার উচ্চতর সোপান নিচয়ে যে সাহিত্য অবস্থিত তাহা সরস সুকোমল ও হৃদয় মনের একান্ত তৃপ্তিকর বটে। এই সাহিত্যকে সুকুমার বা খাস সাহিত্য বলিলে হানি কি?

"ভক্তি, প্রীতি, শান্তি এই তিনটী শব্দে যে বস্তু চিত্রিত তাহার মোহিনী মূর্ত্তির অপেক্ষা মনোহর জগতে আর কিছুই" নাই। "তাহা ত্যাগ করিয়া আর কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করে" না। কিন্তু এই ভক্তি প্রীতি শান্তি সুকুমার সাহিত্যেরই আলোচ্য; এই ত্রিমূর্ত্তির পরিচর্য্যা করিবার জন্যই কি সুকুমার সাহিত্যের জন্ম নয়? ঐ দেবীত্রয়ের উদ্বোধন ও উপা-

---

* কেশবচন্দ্র সেনের ধর্ম্ম-জীবনে এ কথার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে।

জীবন-বেদ ৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সনা করিতে করিতেই কি স্বকুমার সাত্যের সৃষ্টি হয় নাই ?

সকল ধর্ম্মের সার ধর্ম্ম কি ? সকল অনুশীলনের ঐকান্তিক উদ্দেশ্য কি ? "মনুষ্যের যাবতীয় বৃত্তি ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী করা"। "সেই অবস্থাই ভক্তি।" সকল বৃত্তি ঈশ্বরে সমর্পণ ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। ইহাই প্রকৃত কৃষ্ণার্পণ। ইহাই প্রকৃত নিষ্কাম ধর্ম্ম। ইহাই স্থায়ী সুখ। ইহারই নামান্তর চিত্ত-শুদ্ধি। ইহারই লক্ষণ ভক্তি প্রীতি শান্তি। ইহাই ধর্ম্ম। ইহা ভিন্ন ধর্ম্মান্তর নাই"। অর্থাৎ ইহাই সর্ব্বোচ্চ সারাদপি সার ধর্ম্ম।

উচ্চ ধর্ম্মানুশীলনের দ্বারা ও উচ্চ ধর্ম্মানুশীলন জন্য উচ্চ সাহিত্যের উৎপত্তি। উচ্চ ধর্ম্মের সহিত উচ্চ সাহিত্যের ঐকান্তিক যোগ আর সে সাহিত্য সুকুমার সাহিত্য অর্থাৎ সাহিত্যের খোদকস্তা খাস তহশীলের মহল। তাই গীতা একাধারে সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম গ্রন্থ ও সর্ব্বোচ্চ মহাকাব্য। তাই দুর্গেশনন্দিনী গল্পের গল্প হইয়াও অনেকটা ধর্ম্মের ধর্ম্ম ; আবার দেবী চৌধুরাণী ধর্ম্মের ধর্ম্ম অথচ বিলক্ষণ কাব্যের কাব্য। তুমি যাহাকে প্রকৃত ধর্ম্ম বল, আমি তাহাকে রমণীয়

কাব্য বলি। সূক্ষ্মদর্শীর নিকট তোমার ও আমার কথার কিছুই প্রভেদ নাই।

ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকতা এক জিনিস নয়। জ্ঞান ও সাধন পৃথক পদার্থ। উভয়ের সম্মিলনে ধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ। ধর্ম্ম-বিজ্ঞান সংগঠন কল্পে "তত্ত্বজ্ঞান" প্রয়োজন বটে; কিন্তু-সাধন কল্পে—পরমাত্মার সহিত আত্মার সম্মিলন কল্পে সম্পূর্ণ ভিন্ন দ্রব্যের আবশ্যক,—সে দ্রব্য ভাব-ভক্তি, কাব্য-কবিতা, রস-রূপক-রতি। মনের বলে জ্ঞান, হৃদয়ের অনুরাগে মিলন। মিলনই চরমোদ্দেশ্য—ধর্ম্ম-মঞ্চের উচ্চতম আলয়। 'তত্ত্বজ্ঞান' সৃষ্টি-বিজ্ঞান ধর্ম্মের সু-দৃঢ় আবরণ বটে কিন্তু ধর্ম্মের ভিতরের জিনিস মনোহারিণী কবিতা। কবিতাই সুকুমার সাহিত্যের সর্ব্বোপরিস্থিতা পরমারাধ্যা দেবী।

স্বভাবের সুপুত্র কেশবচন্দ্রের ধর্ম্ম-জীবন চোখের উপর দিয়া বাহিয়া অনন্তে যাইয়া মিশিল;—উহা সমালোচনা করিয়া কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই যে উহা যখন কেবল বিজ্ঞানের সহিত সংশ্লিষ্ট, তখন নীরস কর্কশ দুর্ব্বোধ্য তর্ক-যুক্তি-শব্দ-সমাস-ময়। কিন্তু যখন ঐ সাধকের সম্যক চিদ্গত ভাব, তখন তাঁহার পূর্ব্ব

জীবনের সম্পূর্ণ এক নূতন মূর্ত্তি। তখন কেশব কচি-ছেলে,—ভাবে ভোর প্রেমে উন্মত্ত। তখন কেশবের ভাবে ভাষায়, বচনে বক্তৃতায়, প্রার্থনায় উপাসনায়, আ-হারে বিহারে, গমনে উপবেশনে সমগ্র জীবনে কেবলই কবিতা রস আর রূপক। তখন কেশবের জীবনে পূর্ব্বে যেরূপ তদাপেক্ষাও অধিক পরিমাণে নীতি-নিষ্ঠা ছিল, কিন্তু তাহার নিরসত্ব ছিল না; তখন কেশবের জীবনে সম্পূর্ণরূপে সেই একেশ্বরবাদ ছিল, কিন্তু তাহার স্বাতন্ত্র্য ছিল না। তখন কেশব একেশ্বরবাদী তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী বৈজ্ঞানিক হইয়াও পৌত্তলিকের পৌত্তলিক। তখন কেশব সর্ব্বভূতে জগৎজননীর প্রেমময়ী মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখিয়া 'মা', 'মা' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। যেমন মনে প্রাণে ধ্যানে তেমনি পুষ্পচন্দনেও মায়ের পূজা করিলেন। তখন তাঁহার একেশ্বরবাদ পৌত্তলিক-তার * সহিত মিলিয়া গেল। একের সহিত অপরের আর প্রভেদ রহিল না। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিল। † এ জ্ঞান জন্মাইয়া দিল কিসে? দিল প্রেমে। প্রেম

---

* কথাটা কু অর্থে ব্যবহৃত নয়।

† লোকে বলে, ইতিহাসে লেখে যে মানুষ পৌত্তলিকতার স্তর উত্তীর্ণ হইয়া একেশ্বরবাদী হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে উহার পর

উৎপন্ন করিল—সুকুমার কাব্য। সে কাব্য পাঠে নীরস হৃদয় সরস হইবে। সরস হৃদয় বিভু প্রেমে মাতিবে।

---

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে তাহার পর পৌত্তলিক হওয়াও বিলক্ষণ সম্ভবে। সাধক প্রবর কেশবের জীবন তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। কেশব শেষ জীবনে অনাদি অনন্ত কারণ সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরের অনন্ত শক্তির ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া তাঁহাকে কখনও 'মা' বলিয়া ডাকিতেন, কখনও পিতা, প্রাণপতি বলিয়া সম্বোধন করিতেন, কখনও বা বাৎসল্যভাবে 'গোপাল গোপাল' বলিয়া রোদন করিতেন। কখনও লক্ষ্মী, কখনও স্বরস্বতী, কখনও জগদ্ধাত্রী, কখনও বিন্দুবাসিনী নাম করিয়া জগদীশ্বরের চরণ বন্দনা করিতেন। বাহ্য ও অন্তর্জ্জগতের যে কিছু উৎকৃষ্ট দ্রব্য ইষ্টদেবের উদ্দেশে উৎসর্গ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু কোন মুর্খ বলিবে তিনি এ সময়ে একেশ্বরবাদী ছিলেন না। তাঁহার মত ও বিশ্বাস পূর্ব্ববৎ একেশ্বরবাদেই নিহিত ছিল, একটুও বিচলিত হয় নাই; অথচ প্রেম-যোগবলে অধিকতর আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়া সাম্প্রদায়িকতার হাত এড়াইয়াছিলেন। পৌত্তলিকতা সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া একেশ্বরবাদ সাম্প্রদায়িকতা নয় একথা বলিতে পারি না। সাম্প্রদায়িকতা দুইই। যিনি প্রকৃত সাধু ও প্রেমিক তিনি সাধন কল্পে সম্প্রদায় মাত্রেরই বাহির, অথচ সকল ক্ষেত্রেই ব্রহ্ম সম্ভোগ করেন। কেশব ইহা করিতেন। আর একালে তিনিই বিশ্বজনীন সাধনের পথ প্রদর্শক। কেশব আর যাহা হউন আর না হউন, তিনি যে একজন উচ্চশ্রেণীর সাধক সে বিষয়ে আর মত ভেদ নাই। সাধনায় তিনি সিদ্ধ হইতে পারিয়াছিলেন কি না, সে কথা অবশ্য কেহ বলিতে পারে না। তাহা বুঝা

তত্ত্ব-জ্ঞান শুষ্ক। হৃদয়ের রসের সহিত উহা না মিলাইতে পারিলে উহাতে বড় কাজ হয় না। শুদ্ধ তত্ত্ব-জ্ঞানে সিদ্ধি কদাচিৎ সম্ভবে। রস ও রতিবিহীন দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞতা কিছুই নয়। জ্ঞান ও প্রেমের সম্মিলনেই মুক্তি। জ্ঞান প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে নিষ্ফল, প্রেম জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও অনেক কাজ করিতে পারে। তাই জ্ঞান অপেক্ষা প্রেমের আদর। তাই 'ভক্তিতে মিলিবে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর' এই মহাজনোক্তি। তাই সৃষ্টি প্রক্রিয়া সংক্রান্ত কূট কল্পনার সহস্রাধিক প্রবন্ধ অপেক্ষা একটা প্রসাদী পদের বা এক চরণ সোহাগ সঙ্গীতের মূল্য অধিক।

বঙ্কিম বাবু অনুশীলন ধর্ম্মের যে প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন, তাহাতেও এই কথা আসিতেছে। উপরে তাহা একরূপ বলিয়াছি। এখন আরও একটু খোলসা করি।

(১) "শারীরিকী, জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী, চিত্তরঞ্জিনী এই চতুর্ব্বিধ বৃত্তি গুলির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি পরিণতি ও সামাঞ্জস্যই মনুষ্যত্ব।"

(২) এই সর্ব্বাঙ্গীন সমগ্র মনুষ্যত্ব—অর্থাৎ যাবতীয় বৃত্তির স্ফূর্ত্তি পরিণতি ও সামাঞ্জস্য যখন ঈশ্বরানু-

বর্ত্তিনী হয়—সেই অবস্থাই ভক্তি অর্থাৎ ভক্তির পূর্ণাবস্থা।

(৩) কেবল মাত্র এই ভক্তি দ্বারাই ভগবান লব্ধ।

এখন বলা বাহুল্য যে ভক্তি বৃত্তির স্ফূর্ত্তি সম্পাদনার্থে সুকুমার সাহিত্যেরই অধিকতর প্রয়োজন। দাশরথি রামচন্দ্রের চরিত্র যেরূপ পিতৃভক্তি শিক্ষা দিবে, শতাধিক ধর্ম্মোপদেষ্টার উপদেশ একত্রে মিলিয়া সেরূপ কদাচিৎ দিতে পারিবে না। প্রফুল্লমুখীর চিত্র যেরূপ নিষ্কাম কর্ম্মাভিমুখী ভক্তি শিক্ষা দেয়, অনেক কটমটাচার্য্য তাহার দিক্ দিয়াও যাইতে পারেন না। ফলত হৃদ্বৃত্তি বিকশিত ও উত্তেজিত করিতে কাব্য শাস্ত্রেরই প্রাধান্য; আর হৃদ্বৃত্তির অধিকতর সম্প্রাসন ও স্ফূরণই সকল বৃত্তির সামঞ্জস্যের মূল অর্থাৎ ধর্ম্মের উন্নতাবস্থা। অতএব ধর্ম্মের সহিত সুকুমার সাহিত্যের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

---

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

## কাব্য ও কবিতা।

কাব্যের লক্ষণ ও উদ্দেশ্য ;—একমাত্র চিত্তরঞ্জন কাব্যের উদ্দেশ্য নয়, চিত্ত-শুদ্ধি কাব্যের মহত্তর উদ্দেশ্য। সৌন্দর্য্য ও সত্য ; সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ও সৌন্দর্য্যানুভূতি,—কবি ও যোগী। সত্য ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধীয় বিবিধ কথার বিচার ;—কাব্যগত সৌন্দর্য্য বৈচিত্র্যের সমালোচনা। প্রকৃতির পরস্পর বিরোধী অংশ,—ট্রাজিডি ও কমিডি,—উভয়ের প্রকৃতি সমালোচনা, ট্রাজিডি—চিন্তাশীলতা, কমিডি—ক্রীড়াশীলতা, ট্রাজিডি—সান্তে অনন্তের আভাস, উচ্চ বৈরাগ্য ও শান্তি। কাব্যামৃত ধর্ম্মামৃতের অপর নাম। প্রথম পরিচ্ছেদে উক্ত টিণ্ডল লিখিত শান্তির ( repose ) সহিত বঙ্কিম ব্যাখ্যাত 'সুখ' ও সাহিত্যানুশীলন জনিত সন্তোষের সমন্বয়। কবি সৌন্দর্য্য-স্রষ্টা ও ধর্ম্মোপদেষ্টা,—উহার যুক্তি তর্ক ও বিস্তৃত আলোচনা ;

সুকুমার সাহিত্যের কথা প্রসঙ্গে আমরা কাব্য-কবিতার বিষয় উল্লেখ করিতেছিলাম। সে বিষয়ে আরও দুই চারি কথার আলোচনা করিলে মন্দ হইবে না ;—তাহা করা কার্য্যত আবশ্যকও বটে। কাব্যের ষোল আনা লক্ষণ যাহাই হউক তাহার উদ্দেশ্য যে কেবল মাত্র চিত্ত-রঞ্জন ও আমোদ উত্তেজন নয়, ইহা এক আধ জন কূট তার্কিক ছাড়া, আর প্রায় সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হন। শতরঞ্চ খেলা ও শকুন্তলা

পাঠ যে তুল্য মূল্য নয়, ইহা বোধ হয় এখন বেন্থামের শিষ্যেরাও মানিয়া থাকেন।

কাব্যের উদ্দেশ্য এক পক্ষে চিত্ত-রঞ্জন বটে, কিন্তু চিত্ত-রঞ্জন ব্যতীত উহার মহত্তর উদ্দেশ্য আছে, আর সেই উদ্দেশ্যের জন্যই কাব্যের কাব্যত্ব। যাহা চিত্ত-রঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত-শুদ্ধি সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়, তাহাই প্রকৃত প্রস্তাবে কাব্য। কবির কলমের ন্যায় চিত্র-করের তুলিকাও কাব্য উৎপন্ন করিতে পারে। কাব্য যেখানে যেরূপ যে আকারে যদ্দ্বারাই উৎপাদিত হউক, যাহাতে চিত্তরঞ্জক দ্রব্য সংশ্লিষ্ট চিত্ত-শুদ্ধিকর পদার্থ আছে তাহাই কাব্য বটে।

চিত্ত-রঞ্জক ও চিত্ত-শুদ্ধিকর পদার্থ কি? উত্তর,—সৌন্দর্য্য ও সত্য। সৌন্দর্য্যে চিত্তরঞ্জন করে, সত্যে চিত্ত-শুদ্ধি করে। প্রকৃত সত্য সৌন্দর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভবে না। পরন্তু সত্যের ন্যায় সুন্দর পদার্থ জগতে নাই। সত্যই সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা—পূর্ণ সৌন্দর্য্য। যাহা অনৃত—তাহাতে প্রকৃত সৌন্দর্য্যের অবস্থিতি সম্ভবে না। অতএব যাহা অনৃত তাহা উচ্চ শ্রেণীর কাব্যের সম্পূর্ণ অনুপোযোগী।

যিনি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে সক্ষম, তিনি কবি,—

যিনি পূর্ণমাত্রায় সৌন্দর্য্যানুভবক্ষম তিনি কবি না হই-য়াও যোগী হইতে পারেন। সৌন্দর্য্যানুরাগ ও সৌন্দর্য্যানুভব শক্তির পূর্ণ বিকাশ ব্যতিরেকে পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ কদাচ সম্ভবে না। পরমাত্মার কোনরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা যদি সম্ভাবিত হয়, তাহা হইলে একটী মাত্র ব্যাখ্যা আছে! সে ব্যাখ্যা এই যে তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যের কিনা পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আলয়। এখন যদি তোমার সৌন্দর্য্যানুরতি ও সৌন্দর্য্যানুভব শক্তিই না থাকে, কিরূপে তুমি তাঁহার ধ্যান ধারণা যোগ সম্ভোগ করিবে। তাই বলি যাঁহার সৌন্দর্য্যানুরতি আছে, তিনি কবি না হইলেও যোগী। কিন্তু সত্যে ও সৌন্দর্য্যে প্রভেদ কি? প্রভেদ কিছুই নয়। সৌন্দর্য্য সত্যের বহুধা বিকাশ মাত্র। সত্য এক সৌন্দর্য্য বহুবিধ। সৌন্দর্য্য বৈচিত্র্যে জগৎ-সংসার। সৌন্দর্য্য বহুবিধ, যাবতীয় সৌন্দর্য্যে সত্য নিহিত, যেহেতু সৌন্দর্য্য সত্যেরই সম্প্রসারণ। সত্য হইতেই সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি।

সৌন্দর্য্যের নানা রূপ। চন্দ্র মণ্ডলে যে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সূর্য্য মণ্ডলে সে প্রকৃতির নয়। কুসুম-কাননে ও শ্মশানে উভয় স্থানেই সৌন্দর্য্য আছে কিন্তু ভিন্ন

ভিন্ন রকমের। কমনীয় মৃদু মধুর হাস্যে সৌন্দর্য্যের যে ভাবের বিকাশ, কোপ-কটাক্ষে সে ভাবের নয়। তরঙ্গায়িত সমুদ্র বক্ষে এক সৌন্দর্য্য, শ্যামল তৃণক্ষেত্রে আর এক। ভীষণতা ও কমনীয়তা, সজীবতা ও বিশুস্কতা, সুখ ও শোক,—প্রকৃতির সকল অংশেই সৌন্দর্য্য আছে, কেবল তাহার আকার ভিন্ন ভিন্ন।

যেখানে সৌন্দর্য্য সেইখানেই কবিতা। কবিতা সৌন্দর্য্যের সঙ্গিনী সহচরী। অতএব কবিতারও আকার ভিন্ন ভিন্ন। জড় জগতে ও হৃদয় রাজ্যে যেরূপ বৈচিত্র কাব্য রাজ্যেও তদ্রূপ, কেন না কবির সৃষ্টির মৌলিকতা প্রকৃত সৃষ্টি হইতেই সংগৃহীত। স্বভানুকারীতা কাব্য রাজ্যের যথা সর্ব্বস্ব না হইলেও মূল ভিত্তি বটে। সৌন্দর্য্য বৈচিত্রে যেমন সংসার, সৌন্দর্য্য বৈচিত্রে তেমনি কাব্য, সংসারের আলেখ্য অথচ সংসারাতিরিক্ত *। কাব্য রাজ্যে সৌন্দর্য্যের বিচিত্র খেলা।

---

* উত্তর চরিতের সমালোচনায় বঙ্কিম বাবু কথাটা অতি পরিস্কার বুঝাইয়াছেন; দুই এক ছত্র উদ্ধৃত করি;—

"যাহা স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি। তাহাতেই চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। যাহা প্রকৃত তাহাতে তাদৃশ চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। কেন না তাহা অসম্পূর্ণ, দোষ

তথায় কঠিন কোমল, উষ্ণ শীতল, রুক্ষ রসাল, করুণ দারুণ, সুখ শোক সর্ব্বপ্রকার সৌন্দর্য্য বৈচিত্র্যের ও রস বৈপরীত্যের লীলা। এই লীলা ভূমি পর্য্যটন যেমন জীবনান্দদায়ক, তেমনি চিত্তশুদ্ধিকর।

কিন্তু কেমন করিয়া প্রকৃতির পরস্পর বিপরীত ও বিরোধী অংশ নিচয় সৌন্দর্য্যও সুখোৎপত্তির কারণ হয়? 'ট্র্যাজিক' ও 'কমিক' উভয়ই সৌন্দর্য্য নিদান, আনন্দ-প্রদ ও চিত্তশুদ্ধিকর কিরূপে? কাব্য-সংসার

---

সংস্পৃষ্ট, পুরাতন, এবং অনেক সময়ে অস্পষ্ট। কবির সৃষ্টি তাঁহার স্বেচ্ছাধীন—সুতরাং সম্পূর্ণ দোষ শূন্য, নবীন এবং স্পষ্ট হইতে পারে।"

পরন্তু জনৈক কাব্যরসজ্ঞ ইংরাজ লেখকের দুই চারিটি কথা এই;—

"For though it has always been debated how far art is to imitate nature, and probably will be so debated to the end of time, yet there is no question but that it is to be in some way a representation of nature on a smaller scale; that it must satisfy the human sense of completeness—nay, that it must compensate by a greater completeness, a more perfect rounding-off and symmetry, for the limitations under which all human art works, when compared with nature;—in a word that it must have unity. এই দুইটা নোটে কোন কথাটার সমন্বয় করিতে হইবে বুদ্ধিমানকে বলিয়া দিতে হইবে না।

এই দুই পরস্পর বিরোধী অংশে বিভক্ত কেন? যে রাজ্যে ম্যাকবেথ্, হ্যামলেট, রমিও জুলিয়েটের মর্ম্মান্তিক বেদনা, হৃদয়ভেদী যাতনা, সে রাজ্যে ফলষ্টাফের হাস্যোচ্ছ্বাস কেন? যেখানে কৌশল্যা সেখানে কৈকেয়ী কেন? সীতায় সূর্পণখায় সংযোজিত কেন? যে ক্ষেত্রে জগৎ সিংহ, তথায় আবার বিদ্যাদিগ্‌গজের আবির্ভাব কেন? যে সাহিত্যে মেঘনাদ, বৃত্রসংহার তাহাতে আবার পেঁচো-চোয়ালের মুখ-ভ্যাঙ্গচানি কেন? উত্তর,—উহা নহিলে চলিবে কেন? নহিলে সৌন্দর্য্যের শোভা খুলিবে কেন? সামঞ্জস্যের স্থর মিলিবে কেন? একতায় ভিন্নতা ও ভিন্নতায় একতা বুঝা যাইবে কেন? অনৃত হইতে সত্য ও অনিত্য হইতে নিত্য নির্ব্বাচিত হইবে কেন?

উপরি উক্ত প্রশ্নোত্তরের আমূল বিশ্লেষণ অতি আবশ্যকীয় হইলেও বহু বিস্তার সাপেক্ষ, অতএব আপাতত সে লোভ সম্বরণ করিতে হইতেছে। এ সম্বন্ধে মোটের উপর দুই একটী কথা বলিব।

কাব্যগত রস ও সৌন্দর্য্য নিচয় মনুষ্য বৃত্তি নিচয়ের সহিত সহস্রসূত্রে এক সুরে বাঁধা। মনুষ্য-বৃত্তি বহু-বিধ হইলেও যেমন মোটের উপর দুই ভাগে বিভক্ত.

তেমনি কাব্য ঘটিত রস ও সৌন্দর্য্য নানা প্রকার হইলেও তাহাদের দুইটী বিভাগ আছে। এই ভাগ বিভাগ সমালোচক ও আলঙ্কারিকেরা করিয়াছেন। তাঁহাদের শক্তি ইচ্ছা বা রুচি ও দেশ কাল ভেদে, এই ভাগ বিভাগের তারতম্য হইলেও মূল বিষয়গত পার্থক্য অতি অল্প। যেহেতু শ্রেণী নির্ব্বাচনের গোলযোগ থাকিলেও মনুষ্য চিত্ত বৃত্তির গোলযোগ হয় না। তাহাদের যে ভাব, তাহাই থাকে ও থাকিবে।

বৃত্তির প্রধান দুই বিভাগ শারীরিক ও মানসিক,—কাব্যের ট্র্যাজিক (Tragic) ও কমিক (Comic) * অর্থাৎ বিয়োগ বা বৈরাগ্য ব্যঞ্জক এবং রহস্যোল্লাস উদ্দীপক। ট্র্যাজিক সৌন্দর্য্য মানসিক ও কমিক সৌন্দর্য্য শারীরিক ও শারীরিক মানসিক বিজড়িত। এখন মোটের উপর কাব্যের এই দুইটা স্থূল অংশের একটু আলোচনা করিলে মূল প্রশ্ন কতকটা পরিষ্কার হইবে।

দুই দ্রব্যের সম্বন্ধ বুঝিতে সেই দুই দ্রব্যের লক্ষণ

---

* সংক্ষেপের মধ্যে খুব উপযোগী এজন্য এ দুইটা কথা ব্যবহার করিলাম।

ও স্বরূপের পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। প্রথমত আমরা তাহাই একটু করি।

মনুষ্য মনের দুইরূপ অবস্থা মোটের উপর কল্পনা করা যায়। মন কখনও চিন্তাশীল কখনও ক্রীড়াশীল অবস্থাপন্ন হয়। এই দুই অবস্থাই স্বাভাবিক। চিন্তাশীলতাকে মনের মন ও ক্রীড়াশীলতাকে মনের শরীর বলি। মনের এই চিন্তাশীলতা উদ্দীপ্ত বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট করে; আর ট্র্যাজিডি ক্রীড়াশীলতা জাগাইয়া দেয় ও পোষণ করে কমিডি।

সংসারের সকল দ্রব্যের চরম ও গৌণ উদ্দেশ্য এক। কিন্তু সেই একতার মধ্যে রাশি রাশি পার্থক্য ও বিরোধী ভাব। এটী জগতের অতি নিগূঢ় রহস্য। এই রহস্য যিনি প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝিয়াছেন তাঁহার অনেক কথা বুঝা হইয়াছে। সকলেরই মূল উদ্দেশ্য এক অথচ সকলেই যাইতেছে ভিন্ন ভিন্ন পথে। ভিন্ন ভিন্ন পথে যাইয়া,—পরস্পরে বিপরীত ও বিরোধী ভাবাপন্ন হইয়া গৌণ কল্পে সেই একই উদ্দেশ্য সাধিতেছে। একতার মধ্যে থাকিয়া বিরোধীভাবের খেলা খেলিতেছে আর বিরোধীভাবের খেলা খেলিতে খেলিতে জগৎ সৃষ্টির বিচিত্র কৌশলে সেই একতার দিকে ছুটিতেছে।

মনের চিন্তাশীলতা ও ক্রীড়াশীলতা আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরে দুইটী সম্পূর্ণ বিরোধীভাব কিন্তু গৌণ কল্পে উভয়েরই প্রাকৃতিক কার্য্য এক বটে ও উহাদের কার্য্য-গত চরমোদ্দেশ্য ও ভিন্ন ভিন্ন নয়। ট্র্যাজিডির উদ্দেশ্য ও চিত্তশুদ্ধি, কমিডির গৌণ উদ্দেশ্যও তাই,—কিরূপে তাহা পরে বিচার করিতেছি।

মনের চিন্তাশীলতা ও ক্রীড়াশীলতা পরস্পর বিরোধী ভাব। মন যখন ক্রীড়াশীল অন্তত তাহাতে যখন ক্রীড়াশীলতা উদ্দীপন করার চেষ্টা হয় তখন চিন্তামাত্র যাহাতে তাহারদিকে না "ঘেঁসে" এমত করা প্রয়োজন। তখন মন সম্পূর্ণরূপে চিন্তাশূন্য, ভাবনা শূন্য; আশয় উদ্দেশ্য বন্ধন মাত্র শূন্য হইয়া কেবল নাচিবে হাসিবে আর মাতিবে পুলকে "পূর্ণ কানেকান" হইয়া উছলিয়া পড়িবে, ক্ষণিক আনন্দের অস্থায়ী রহস্যোল্লাসের আবেগময় উচ্ছাসে মন তখন কেবল উধাও ছুটিবে। মনের এই অবস্থাকেই তাহার ক্রীড়া-শীল অবস্থা বলি। দাবা টিপিতে বসিয়া মন যেরূপ 'বিটকেল' ভাবাপন্ন হয় অবশ্য তাহার কথা বলিতেছি না। মনের উল্লিখিত ক্রীড়াশীলতা যে কার্য্য নাটকে উত্তেজিত হয়, তাহাই মোটের উপর "কমিক" অংশে

শ্রেষ্ঠ। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শ্লেষ রহস্য কমিডিরই অন্তর্গত। কেবল মিলনান্ত কাব্য নাটকই যে "কমিডি" তাহা নয়।

পরন্তু মনের চিন্তাশীল অবস্থা কিরূপ? চিন্তা ত নানা প্রকৃতির আছে। রুষিয়ার জারও চিন্তা করেন আর ওপাড়ার গোবরার মাও চিন্তা করে। জার চিন্তা করেন কিরূপে রাজ্য বিস্তার হইবে। গোবরার মা চিন্তা করে কোন উপায়ে "গোবর্দ্ধনের" শুভ বিবাহ দিবে। উভয়েরই চিন্তা চিন্তা বটে। চৌধুরীদের কুমুদিনী চিন্তা করে চূড় চৌদানীর, আর ঐ কেরাণী বাবু চিন্তা করেন মনিবের মুখ ভ্যাঙচানির; উভয়েরই চিন্তা চিন্তা বটে। কেন না উভয়ই স্বপ্ন চিন্তায় চিন্তিত, একান্ত ব্যতিব্যস্ত; এখন কুমুদ বা কেরাণী বাবু, রুষ সম্রাট বা গোবরার মা যে চিন্তায় চিন্তান্বিত সে প্রকৃতির চিন্তাকে আপাতত আমরা চিন্তাশীলতা বলিতেছি না, এ কথা বোধ হয় আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। শয্যাসঙ্গিনীর চূড়-চৌদানীর চিন্তা লক্ষ্যে অলক্ষ্যে প্রতি মুহূর্ত্তে মস্ত ট্র্যাজিডি, প্রকাণ্ড হুলস্থূল কাণ্ড ঘটায়, ঘটাইতে পারে বটে; কিন্তু সে বিষয়ে পাঠক মহামতি 'নবীন ও প্রবীন' আপাতত আমাদিগকে

ক্ষমা করিবেন। 'কৈফিয়ৎ' চাহিবেন না। রাজনৈতিক চিন্তা করেন 'রাজ্য শাসন'; সমাজনৈতিক করেন—সমাজ বন্ধন; বৈজ্ঞানিক ব্যবচ্ছেদ বিশ্লেষণ লইয়া 'হরণ পূরণের' চিন্তায় একান্ত নিযুক্ত। কেহ চিন্তা করিতেছেন বিধবার ব্রহ্মচর্য্য কেহ বা ভাবিতেছেন,—শাঁখা-সাড়ী-সিঁন্দুর পরাইয়া কিরূপে কতদিনে দিবেন তাহার বিবাহ। দুই দিক দিয়া দেখিলে দুই জনের কাহারই চিন্তা কম প্রশংসনীয় নয়। সে যাহা হউক, এখন কথা এই যে পৃথিবীতে যত প্রকার চিন্তা তাহা সমস্তই একটী চিন্তার নিকট পরাভূত হয়,—একটী চিন্তায় ডুবিয়া যায়। সে চিন্তা ইহ পার্থিব জীবনের অস্তিত্বের অস্থায়ীত্ব বিষয়িণী চিন্তা,—সে চিন্তা অনন্ত সাধ্যের পারম্পারিক সম্বন্ধ বিষয়ক; সে চিন্তায় অন্য যাহা কিছু চিন্তা নামের বাচ্য তাহা ডুবিয়া যায়, সে চিন্তায় মানুষের মনে বৈরাগ্য উদয় ও উদ্দীপ্ত করে। বৈরাগ্য চিত্ত শুদ্ধি করে।

আমি কি, আমি কেন, আমি কয় দিনের জন্য? আমার এই সুন্দর শরীর, ততোধিক সুন্দর হৃদয়—আমার জ্ঞান পূর্ণ বিজ্ঞান মার্জ্জিত মন, আমার রুচি রসজ্ঞতা, সহানুভূতি সহৃদয়তা, স্নেহ দয়া প্রণয় বন্ধুত্ব,

পরিবার প্রেম আত্মীয় অন্তরঙ্গ,—যাহা ও যাহাদের বিহনে আমি 'পলকে প্রলয়' জ্ঞান করি, হায় এ সমস্তই অনিত্য। আমার সর্ব্ব প্রকার সাংসারিক সুখ, পারিবারিক বন্ধন, সামাজিক সম্বন্ধ, মুহূর্ত্তেকের লীলা-খেলা। আমি এই আছি এই নাই। সংসারে দুঃখ শোকও আছেই আছে। দুঃখ শোকই অধিকাংশের অবশ্যম্ভাবী অধিকার। কিন্তু যিনি আজীবন কোন শোকে সন্তপ্ত হন নাই, কোন দুঃখে ম্রিয়মান হন নাই, কোন বিঘ্ন বিপত্তি যাতনা ভাবনা যাঁহার অঙ্গ কখনও স্পর্শ করে নাই, তাঁহারই বা শেষ দশা কি? তিনিও ত কৃতান্তের করতলস্থ, নিয়তির অনিবার্য্য হস্তায়ত্ত,—কালের কালিমাময় করাল-জাল-বিজড়িত,—যমের কঠিন দংষ্ট্রাভ্যান্তরে নিপতিত! এই এখন আর তখন যখনই হউক অবিলম্বে তাঁহার অস্তিত্ব উড়াইয়া দিবে—সেই দুরন্ত দুর্দ্দান্ত সর্ব্বগ্রাসী সর্ব্বসংহারী পদার্থ—মৃত্যু। মৃত্যু অহো কি ভয়ঙ্কর নাম!! কি ভয়ঙ্করী শক্তি!! হায় ঐ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—শিয়রে শয্যা পার্শ্বে সম্মুখে পশ্চাতে বামে দক্ষিণে উত্তরে পশ্চিমে সর্ব্বত্রে আমার সান্নিধ্যে প্রতিক্ষণে দাঁড়াইয়া ঐ মৃত্যু!!! এই এখন আর তখন—আমি আমার প্রিয়

বস্তু ছাড়িয়া যাইব! আমার প্রিয় বস্তু আমায় ছাড়িয়া যাইবে! প্রিয় প্রিয়তর প্রিয়তম যিনি, জীবনের বল সংসারের সম্বল, আঁধারের জ্যোতি, অন্ধের একমাত্র যষ্টি, দরিদ্রের মাণিক, হৃদয়ের আশা,—সাগরছেঁচা ধন হায় হায় ঐ কোথায় চলে গেল!! ফিরিল না আর ফিরিবে না। নিমেষে এমন স্থানে লুকাইয়াছে যেখানে সকলেই যায় কিন্তু কেহই ফিরে না! স্নেহের বন্ধন জীবের জীবন অহো এই আছে এই নাই!

সংযোগে বিয়োগ, সম্ভোগে সংহার, প্রণয়ে বিচ্ছেদ, আশায় নৈরাশ্য, কামনায় বিড়ম্বনা, অমৃতে গরল, বাড়াভাতে ছাই—অহো সংসারের দশাই এই! এ সকলই অনিত্য অস্থায়ী ক্ষণেকের খেলা!

মনুষ্য মনের উপরি উক্ত অবস্থা স্থর বা চিন্তা ট্র্যাজিক ভাবাপন্ন। মনের এই অবস্থা ভাব স্থর বা চিন্তাকে আমরা চিন্তাশীলতা বলিতে ছিলাম। এই চিন্তা, সান্তরে সীমান্ত সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, অনন্তের! এই চিন্তা—অন্য চিন্তা মাত্রের উচ্চতমস্তরে স্থিত। সকল চিন্তা এই চিন্তায় আসিয়া মরে। তাই ইহাকে প্রকৃত চিন্তাশীলতা বলি। এই চিন্তাশীলতা মনুষ্যের অতি মূল্যবান অধিকার। এই চিন্তায় জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে

মনুষ্য ক্ষণেকের জন্যও চিন্তান্বিত হইয়া থাকেন। এই চিন্তার উদ্দীপন ও স্থায়িত্বের প্রথম ফল বৈরাগ্য—দ্বিতীয় চিত্ত-শুদ্ধি, তৃতীয়—পরমার্থ চিন্তা। এতদ্দ্বারা মনুষ্য সংসারের অসারতা অনুভব করিয়া সার পদার্থের অনুসন্ধানে রত হয়, সকাম কর্ম্ম ছাড়িয়া নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। সংকীর্ণ প্রণয় পাশ ছেদ করিয়া বিশ্বপ্রেমে প্রেমিক হয়। সংসারের দূষিত দুর্গন্ধময় বায়ু রাশির মধ্যে, নীচতার ক্ষুদ্রতার স্বার্থপরতার বিষ্ঠা প্রণালীর অভ্যন্তরে মানুষ যখন একান্ত নিমগ্ন—যখন স্বার্থসুষুপ্ত মোহ নিদ্রায় অভিভূত, অকস্মাৎ ঘটনা সূত্রে তাহার অন্তরে উপরি উক্ত ভাবের উদ্রেক হইলে সে ক্ষণেকের জন্যও জাগিয়া উঠে, মুহূর্ত্তের জন্যও নরককুণ্ডের মধ্য হইতে মাথা তুলে। শ্মশান-বৈরাগ্য ক্ষণেকের জন্য বটে তবুও তাহার উপকারিতা অনেক।

এই শ্মশান বৈরাগ্য, এই ট্র্যাজিক ভাব, এই উচ্চতর চিন্তাশীলতা মানুষের মনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উদ্রেক ও উদ্দীপ্ত করিতে পারেন কবি। তাই দেশ কাল নির্ব্বিশেষে সর্ব্বোপরি কবি-শক্তির আদর ও সম্মান, শ্রদ্ধা ও পূজা।

সংক্ষেপত, ট্র্যাজিডি প্রদান করে—সান্তে অনন্তে আভাস,—প্রমাণ করে সংসারের অনিত্যতা ও মনুষ্য জীবনের বিয়োগ প্রবণতা আর দেখায় অদৃষ্ট গতির সহিত ইচ্ছাশক্তির সংগ্রাম। সংগ্রাম দেখাইয়া সম্বন্ধ বুঝায়,—সান্তে অনন্তে সমন্বয়ের জন্য।

উপরোক্ত প্রকৃতির কাব্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক Schlegel বলেন ;—If therefore we must explain the distinctive one of tragedy by way of theory we would give it thus : that to establish the claims of the mind to a divine origin, its earthly existence must be disregarded as vain and insignificant, all sorrows endured and all difficulties overcome. *

উন্নত সাহিত্যের উদ্দেশ্য এই। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এই বই আর কি ?

পুনশ্চ ;—

Tragedy, by painful emotions, elevates us to the most dignified views of humanity, being in the words of Plato "the imitation of the most beautiful and excellent life." [হৃদ্বৃত্তি শোক সন্তপ্ত করিয়া, মনুষ্যত্বের উচ্চতম মঞ্চে মনকে উত্থিত

---

* আত্মার ঐশ্বরিক উৎপত্তি স্থাপনার্থে সংসারের অনিত্যতা প্রদর্শন করা ট্র্যাজিডির উদ্দেশ্য।

করে, ট্র্যাজিডি ;—যাহার ফলে সৌন্দর্য্যের ও পবিত্রতার অনুশীলনে ও অনুকরনে মন প্রধাবিত হয় ]

এই স্থানে পাঠক পুনরায় বঙ্কিম বাবুর অনুশীলন ধর্ম্ম স্মরণ করুন। Imitation of the most beautiful and excellent life. ষড়ৈশ্বর্য্য সমন্বিত আদর্শের অনুসরণ। কেন? না, পূর্ণ মনুযত্ব ও মোক্ষলাভ জন্য। সে আদর্শ কে? সে আদর্শ তিনিই যাঁহাকে কেহ বলে অনন্ত কেহ বলে আল্লা, কেহ জোভ কেহ জোভেয়া, যাঁহাকে কেহ বলে কৃষ্ণ কেহ বলে খৃষ্ট।

এখন দেখুন বঙ্কিম বাবু আজ যাহা বলিতেছেন, শত সহস্র যুগ পূর্ব্বে প্লেতও তাই বলিয়াছিলেন সর্ব্বজন আরাধ্য আর্য্য ঋষিরাও তাই বলিতেন আর তাহাই শিক্ষা দেয় কাব্য সাহিত্য।

কমিডির সম্মান সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে ও ট্র্যাজিডির প্রকৃতিগত ভাব মোটামুটী রকম যাহা কিঞ্চিত বলা হইল তাহাতে এতদুভয়ের পারস্পারিক সম্পূর্ণ বিপরিত ভাবাপন্নতা সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলিতে হইবে না। ট্র্যাজিডি চিন্তাশীলতা, কমিডি ক্রীড়াশীলতা বা চিন্তাশূন্যতা। মনুষ্য জীবনে মনুষ্যবৃত্তি নিচয়ের গঠন ও সঞ্চালন, গতি ও প্রকৃতির যেরূপ শৃঋলা ও সংযোগ তাহাতে মনুষ্যত্ব সিদ্ধি বা সাধনার্থে

এতদুভয়েরই প্রয়োজন। এক উদ্দেশ্যের দুই উপায় আর সেই দুই উপায় বিরোধী ভাবাপন্ন হইয়াও পরস্পরে সুদৃঢ় সম্বদ্ধ। চিন্তাশীলতা উচ্চ ক্রীড়াশীলতা ভিন্ন সোপান। উচ্চ সোপান উঠিবার জন্যই নিম্ন সোপানের অস্তিত্ব। ক্রীড়া কৌতুক রঙ্গ রহস্য হাস্য পরিহাসের পর মন নব বলে বলিয়ান, তীব্র বেগে ধাবমান হয়—উচ্চতর ও কঠিনতর চিন্তার দিকে। যেখানে কার্য্য আছে সেইখানেই বিশ্রামের প্রয়োজন। ক্রীড়াশীলতা মনের এক প্রকার বিশ্রাম—আর চিন্তাশীলতা কার্য্য, চরমোদ্দেশ্য শান্তি লাভ। তার পর All opposites can be fully understood only by and through each other; consequently we can only know what is serious by knowing also what is laughable and ludicrous. ইহা সক্রেটিসের কথা—সকলেরই কথা। ইহা সমালোচনার মূল ভিত্তি—মনুষ্য জ্ঞানের প্রথম ও প্রধান সোপান! কাব্য রাজ্যেও এতন্নিবন্ধন ভাব-বৈচিত্র্য। পরস্পর বিসদৃশ ও সদৃশ ভাবের সংযোগ বিয়োগেই ভাবের স্ফুরণ ও মনোহারিত্ব। চিন্তাশূন্যতার সফরী চাঞ্চল্যে ও লীলরঙ্গেই চিন্তাশীলতার স্থির সৌন্দর্য্য ও গভীর মাহাত্ম্য। প্রণয়ের প্রাখর্য্য হেতুতেই বিচ্ছে-

দের জ্বালাময়ী যাতনা। আশক্তির তীব্রতা না বুঝিলে এ সংসারে কে বৈরাগ্যে দেবভাব দেখিত?

পরীক্ষায় শিক্ষা, শিক্ষায় পরীক্ষা, মানুষের সমস্ত জীবন ব্যাপারটার নিয়মই এই। কাব্য রাজ্যে সৌন্দর্য্য বিকাশ, মুখ্য কল্পে না হইলেও, গৌণ কল্পে মানুষকে শিক্ষাই দেয়। শিক্ষা দেয় বলিয়াই পরীক্ষা ব্যতীত সুশিক্ষা, পরিপক্ক শিক্ষা সম্ভবে না। কাব্য যেমন সম্ভোগের সামগ্রী তেমনি শিক্ষার স্থল। উভয়েতেই পরীক্ষার তীব্র অগ্নি-স্তর পর্য্যটন প্রয়োজন হইয়া থাকে। প্রকৃতির সঞ্চয় বিপর্য্যয় সঞ্চার ব্যভিচার স্থায়ী অস্থায়ী ভাব মাত্রই আস্বাদ করিয়া চলিতে হয়। উদ্দিষ্ট গন্তব্য স্থল অবশ্য এক মাত্র অনন্ত স্থায়ী পদার্থ, কিন্তু তাহার উদ্দেশে অনুশীলন পথে অসংখ্য অস্থায়ী অথচ উগ্র ও উত্তপ্ত উর্ম্মিময় অগ্নি-স্রোত 'পাস' করিয়া, পার হইয়া যাইতে হয়। অতএব কাব্য রাজ্যে প্রবৃত্তি 'প্যাশন' (Passion) পাপপুণ্য সঞ্চারী ব্যভিচারী রূপ-রস মাত্রই জীবন্ত মূর্ত্তিমান। নহিলে সৌন্দর্য্যের আকুঞ্চন প্রসারণ হয় না। আকুঞ্চন প্রসারণ না হইলে সৌন্দর্য্যের সর্ব্বাঙ্গ দেখা যায় না।

সৌন্দর্য্যের সর্ব্বাঙ্গ দেখান কবির কাজ। সৌন্দর্য্যের সঙ্গে কবি যে আমাদিগকে কুৎসিতও দেখান তাহা কেবল সৌন্দর্য্যের সর্ব্বাঙ্গ দেখাইবার জন্য—তাহার শোভা প্রভা আমাদিগকে সম্যকরূপে বুঝাইবার জন্য। নতুবা যাহা কুৎসিত ও কৃত্রিম, যাহা অনিত্য ও অস্থায়ী তাহা কবির অনুসরণীয় নহে। সৌন্দর্য্যই তাঁহার অনুসরণীয় ও চির উপাস্য। যাহা নিত্য ও সত্য তাহাই পূর্ণ সৌন্দর্য্য। কবি সৌন্দর্য্য প্রচার দ্বারা সত্যেরই মহিমা প্রচার করেন, শান্তির পথই পরিস্কার ও প্রশস্থ করিয়া দেন। একটী কবিতা বা কাব্য পাঠের স্থায়ী লাভ,—আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য কি? জনৈক উচ্চ শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক ইংরেজ লেখক এইরূপ জবাব দেন;—Poetry holds before us a lofty standard of pleasure, takes us out of our ordinary selves into our better selves, makes us feel that we can do more than we thought, and thus performs its parts towards that which is the ultimate practical result of all forms of intellectual energy—the giving us readiness and strength to quit ourselves like men in the field of life. [ কাব্য আমাদিগকে মনুষ্যত্ব শিখায়, মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্বে লইয়া যায়। ]

কাব্যামৃত বস্তুতই স্বর্গীয় সুধা—ইহা ধর্ম্মামৃতের

অপর নাম। এই স্বর্গীয় সুধা ইহ সংসারেই প্রাপ্তব্য। ইহা যেমন শান্তিপ্রদ তেমনি স্বাস্থ্যকর। ইহা মানুষকে পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্বে টানিয়া আনে। সংসারের সংক্রামক ম্যালেরিয়া দূষিত বায়ুরাশির মধ্যে তাহার আধ্যাত্মিক স্নায়ু সবল করিয়া দেয়। মনুষ্য এতদ্দ্বারা সংসার সংগ্রামে প্রকৃত মনুষ্যত্ব ধর্ম্ম পালনে সুপারগ হয়।

বঙ্কিম বাবুর মতে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সুখ। কাব্য রস কি প্রকৃতির সুখ প্রদান করে? উপরি উক্ত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থকার বলেন,—সে সুখ high, soul-elevating enduring, spiritual এবং etherial সংক্ষেপত এ সুখ স্বর্গের স্থায়ী সুখ না হইলেও ইহ সংসারে তাহার আভাস বটে। পাঠক এ স্থলে টিণ্ডলের মনুষ্য জীবন ব্যাখ্যার সেই repose স্মরণ করিতে পারেন। এ সুখ —সেই repose ইহা সেই শান্তি ধর্ম্ম মাত্রের নীতি মাত্রের শাস্ত্র ও সংযম মাত্রের অল্পাধিক পরিমাণে উদ্দেশ্য।

অতএব কবি এক দিকে যেমন সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা ও সেবক অপর দিকে তেমনি ধীমান ধর্ম্মোপদেষ্টা পরাক্রান্ত প্রফেট। সেলি বলেন The poet interprets

the world to itself. কারলাইল বলেন The poet is a new instructor and preacher of Truth to all men. এ প্রকৃত কথাই বটে। কে কবে বলিতে পারিবে ব্যাস বাল্মিকী মিল্টন ধর্ম্মোপদেষ্টা নহেন? যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে পৃথিবীর ধর্ম্মাচার্য্য—তাঁহারাও কবি-শক্তি সম্পন্ন। কে কবে বলিবে কৃষ্ণ খ্রীষ্ট শাক্য শঙ্কর প্রহ্লাদ চৈতন্য কবি নহেন? কবি নহেন! ইহাঁরাই ত মহাকবি। ইহাঁদের কবিত্ব স্রোত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত—অনন্ত উচ্ছ্বসিত। ইহাঁরা আদর্শ মনুষ্য ইহাঁদের ত কথাই নাই। প্রচার ক্ষেত্রের আধুনিক আচার্য্যদিগের মধ্যে যাঁহাদের দ্বারা ধর্ম্মরাজ্য কথঞ্চিৎ রূপেও বিস্তার হইতেছে তাঁহারাও কবিত্ব সম্পন্ন। কবিত্ব সম্পন্ন বলিয়াই তাঁহাদের দ্বারা উক্ত কার্য্য হইতেছে নতুবা হইত না। মনুষ্যের হৃদয় স্পর্শ না করিতে পারিলে তাহার দ্বারা ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই করান যাইতে পারে না। হৃদয় স্পর্শ করিবার শক্তি কেবল কবিরই আছে।

কবি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধর্ম্মোপদেশ দেন না। তাঁহার এক মাত্র লক্ষ্য সৌন্দর্য্য। যদ্দারা সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে। তিনি তদর্থে স্বতঃ জীবন

উৎসর্গ করেন। তিনি ধর্ম্মও বুঝেন না অধর্ম্মও বুঝেন না, তিনি বুঝেন কেবল সৌন্দর্য্য। কবি সৌন্দর্য্যের পথে সুন্দর আলোক জ্বালিয়া দিলেন তোমার যথায় ইচ্ছা তথায় যাও। তিনি তোমাকে তাঁহার অধীন করিতে চাহেন না, কেননা অধীনতা সৌন্দর্য্যের বিরোধী। সৌন্দর্য্য ক্ষেত্রে তোমার পুরা স্বাধীনতা। তথায় নিষেধক প্রতিবন্ধক নাই। কিন্তু সৌন্দর্য্যের টান বড় টান। সে টান তোমার জ্ঞাতে হউক অজ্ঞাতে সত্য ও ধর্ম্মের দিকে লইয়া যাইবে। বহুসংখ্যক ধর্ম্ম ব্যবসায়ী ধর্ম্মোপদেষ্টা অপেক্ষা কবিকুলের জনৈক ক্ষুদ্র ব্যক্তিও প্রকৃত ধর্ম্ম প্রচারক; যেহেতু তাঁহার চিত্র জীবন্ত তাঁহার উক্তি হৃদয়স্পর্শী। অতএব বলা বাহুল্য যে ধর্ম্ম ব্যবসায়ী শাস্ত্রজীবী পুরোহিতবর্গের বাঁধি উপদেশ অপেক্ষা সৌন্দর্য্য মাত্র প্রাণ, কবি কৃত একখানা জীবন আলেখ্য ধর্ম্মোন্নতি কল্পে অধিকতর ফলপ্রদ। বঙ্কিম বাবু এই কথাটা এত পরিষ্কার বুঝাইয়াছেন যে এ সম্বন্ধে তাঁহার সব কয়টা কথা উদ্ধৃত না করিয়া পারিতেছি না।

"কাব্যের উদ্দেশ্য নীতি-জ্ঞান নহে কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের

গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধি জনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতি নির্ব্বাচন দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নীতি-শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য।

*                *                *                *

"চোর চুরি করে। রাজা তাহাকে বলিলেন 'তুমি চুরি করিও না; আমি তাহা হইলে তোমাকে অবরুদ্ধ করিব।' চোর ভয়ে প্রকাশ্যে চুরি হইতে নিবৃত্ত হইল, কিন্তু তাহার চিত্তশুদ্ধি জন্মিল না। সে যখনই বুঝিবে, চুরি করিলে রাজা জানিতে পারিবেন না, তখনই চুরি করিবে।

"তাহাকে ধর্ম্মোপদেশক বলিলেন 'তুমি চুরি করিও না—চুরি ঈশ্বরাজ্ঞা বিরুদ্ধ।' চোর বলিল 'তাহা হইতে পারে কিন্তু ঈশ্বর যখন আমার আহারের অপ্রতুল করিয়াছেন, তখন আমি চুরি করিয়াই খাইব।' ধর্ম্মোপদেশক কহিলেন 'তুমি চুরি করিলে নরকে যাইবে।' চোর বলিব 'তদ্বিষয়ে প্রমাণাভাব।'

"নীতিবেত্তা কহিতেছেন, 'তুমি চুরি করিও না, কেননা চুরিতে সকল লোকের অনিষ্ট, যাহাতে সকল লোকের অনিষ্ট, তাহা কাহারও কর্ত্তব্য নহে।' চোর বলিবে,—'যদি সকল লোক আমার জন্য ভাবিত, আমি তাহা হইলে সকলের জন্য ভাবিতে পারিতাম। লোকে আমাকে খেতে দিক্ আমি চুরি করিব না। কিন্তু যেখানে লোকে আমাকে কিছু দেয় না, সেখানে তাহাদের অনিষ্ট হয় হউক, আমি চুরি করিব।'

"কবি চোরকে কিছু বলিলেন না, চুরি করিতে নিষেধ করিলেন না। কিন্তু তিনি এক সর্ব্বজন মনোহর পবিত্র চরিত্র সৃজন করিলেন। সর্ব্বজন মনোহর তাহাতে চোরের মন মুগ্ধ হইবে। মনুষ্যের স্বভাব, যে যাহাতে মুগ্ধ হয়, পুনঃ পুনঃ চিত্ত প্রীত হইয়া তদালোচনা করে। তাহাতে আকাক্ষা জন্মে—কেননা লাভাকাঙ্ক্ষার নামই অনুরাগ। এইরূপে পবিত্রতার প্রতি চোরের অনুরাগ জন্মে। সুতরাং চুরি প্রভৃতি অপবিত্র কার্য্যে সে বীতরাগ হয়।

"আত্মপরায়ণতা মন্দ তুমি আত্মপরায়ণ হইও না।" এই নৈতিক উক্তি রামায়ণ নহে। কথাচ্ছলে এই নীতি প্রতিপন্ন করিবার জন্য রামায়ণ হয় নাই।

কিন্তু রামায়ণ হইতে পৃথিবীর আত্মপরায়ণতা দোষের যতদূর পরিহার হইয়াছে ততদূর ঈশা এবং বুদ্ধ ভিন্ন কোন নীতিবেত্তা, ধর্ম্মবেত্তা, সমাজকর্ত্তা, বা রাজা বা রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক হয় নাই। * * * উদ্দেশ্য এবং সফলতা উভয় বিবেচনা করিলে, রাজা, রাজনীতি-বেত্তা, ব্যবস্থাপক, সমাজতত্ত্ববেত্তা, ধর্ম্মোপদেষ্টা, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সর্ব্বাপেক্ষাই কবির শ্রেষ্ঠত্ব। কবির পক্ষে যেরূপ মানসিক ক্ষমতা আব-শ্যক, তাহা বিবেচনা করিলেও কবির সেইরূপ প্রাধান্য। কবিরা জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা এবং উপকারকর্ত্তা এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মানসিক শক্তি-সম্পন্ন।" *

---

* বিবিধ সমালোচন ৫৫-৫৬ পৃ।

——:-*-*-:——

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

## উপসংহার।

সার সংগ্রহ ;—উচ্চ সাহিত্যের অনুশীলনে ধর্ম্মেরই অনুশীলন হয় ; উচ্চ ও ইতর সাহিত্য উভয়ই অবশ্যম্ভাবী। নব্য বঙ্গে অধুনা ইতর সাহিত্যের প্রাদুর্ভাব। Substance of religion is culture, সাহিত্যালোচনার "মধ্যশ্রেণী" হইতে "উচ্চশ্রেণীতে" আরোহণ, বঙ্কিম বাবুর সাহিত্য-জীবনের সংক্ষেপ সমালোচনা,—তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের অভ্যুদয়,—তাহার ফল ;—সাহিত্যগত ধর্ম্ম। কেশব বাবুর ধর্ম্ম-জীবন, -ধর্ম্মমূলক সাহিত্য। উক্ত দুই ব্যক্তির প্রতিভা, তাহার স্বতন্ত্র প্রকৃতি। প্রথমোক্তের প্রতি শেষোক্তের অনুরাগ,—উভয়ের ধর্ম্মমতের সৌসাদৃশ ভাব। সাহিত্য, "সামিপ্য ও সাযুয্যের" সহায়ক। সমাপ্তি।

আমাদের আর অধিক বাক্য ব্যয়ের প্রয়োজন নাই। পৃথিবীতে ধর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধি কল্পে সাহিত্যের বা সুকুমার সাহিত্যের যে পরিমাণে অধিকার ও উপ-যোগীতা তাহা সম্যকরূপে না হউক প্রচুর পরিমাণে আমরা এক্ষণে আলোচনা করিয়াছি। সক্ষেপতঃ কথাটা এই যে সৎ সাহিত্যের উচ্চ সাহিত্যের চর্চ্চায় অতি রমণীয় প্রণালীতে উচ্চতর ধর্ম্মেরই চর্চ্চা করা

হয়। তবে ধর্ম্মের ন্যায় সাহিত্যেরও উচ্চ নিম্ন স্তর আছে এবং অধিকার ভেদে উভয়েরই স্তর বিভাগ দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ যাহার যেমন অধিকার বা শক্তি ধর্ম্মের ও সাহিত্যের তদনুরূপ স্তরের সে পর্য্যটক। অতএব উচ্চ ও ইতর সাহিত্য উভয়ই অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের নিজের দেশ লইয়াই আমাদের কথা। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে ইতর সাহিত্যের কিছু বেশি বেশি আমদানি হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। এই আমদানি আবশ্যকতা অনুসারে হইতেছে, ইহা কাজেই স্বীকার করিতে হয়। সাহিত্য যখন ব্যবসায় যাইয়া দাঁড়াইতেছে তখন কাটতির উপর লাভালাভ গণনা করিয়া, বাণিজ্যের যুক্তিযুক্ত নিয়মানুসারে, উহার আমদানি রপ্তানি হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ইতর সাহিত্যের অধিক পরিমাণে কাটতি, অতএব উহার অধিকতর আবশ্যকতা, সুতরাং তদনুরূপ আমদানি। ইহা বেশ ব্যবসার কথা বটে। কিন্তু সকল স্থলেই কি আবশ্যকতা অনুসারে আমদানি করাটা ভাল? অনেক লোকে মদ খায়, মদের যথেষ্ট আবশ্যকতা (Demand) আছে। এজন্য দ্বারে দ্বারে খোলা-ভাটীর ব্যবস্থাটা কি ভাল হইয়াছে? লোকের

বেশ্যাশক্তি আছে তাই কি যেখানে সেখানে বেশ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে? আবশ্যকতার সৃষ্টি স্থিতি ধ্বংশ অনেক স্থলে অনেক পরিমাণে মানুষেরই হাতের কাজ। যাঁহারা দোকান খুলিয়া বঙ্গ সাহিত্য 'যোগানের' সাময়িক ভার লইয়াছেন তাঁহারা এ বিষয়টা একটু ভাল করিয়া ভাবিয়া কাজ করিলে ভাল হয় না কি? এ কথা এ ক্ষেত্রে এই খানেই শেষ।

যদিচ আমরা একে একে অনেকগুলা কথা বলিয়াছি বা বলিবার চেষ্টা করিয়াছি, আমাদের সব কথা এখনও শেষ হয় নাই। অতএব উপসংহারে আরও এক আধ কথা। এই এক আধ কথা মূল বিষয়ের প্রমাণ স্থলেও বটে।

সাহিত্যালোচনাকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া ইত্যাগ্রে আমরা বলিয়াছি যে মধ্যশ্রেণীর সাহিত্যালোচনার অর্থাৎ সাহিত্যগত সৌন্দর্য্যের জন্য সাহিত্যালোচনায় যাঁহারা নিযুক্ত, মানসিক ক্রম বিকাশের নিয়মানুসারে সাহিত্যালোচনার সর্ব্বোচ্চ গ্রামে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ধর্ম্মানুরতিতে তাঁহাদের উপস্থিত হওয়াই স্বাভাবিক। অদ্যকার বঙ্গসাহিত্যেই ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখিতে পাইতেছি। Substance

of religion is culture এ কথা বঙ্গীয় পাঠকদিগের নিকট প্রথমতঃ যিনি উপস্থিত করেন তাঁহার নিজের সাহিত্য জীবনেই উহার অত্যুজ্জ্বল প্রমাণ প্রাপ্ত হই। বঙ্কিম বাবুর সাহিত্য-জীবন খুব একটা প্রকাণ্ড নয়, উহা দিগ্‌গজ-পাণ্ডিত্বের, বা অতলস্পর্শিনী গবেষণার আধারও নয়। উহা হইতে স্তুপাকার গ্রন্থরাশিও উৎপাদিত হয় নাই, কিন্তু তথাচ উহা বড় সুন্দর; খুব স্বাভাবিক। বঙ্কিম অপেক্ষা খুব বড় দরের পণ্ডিত, বঙ্গ-সাহিত্যে আজি এক আধ জন নয় বহুজন আছেন, তাঁহার অপেক্ষা জেয়াদা জ্ঞানবান গ্রন্থকার ও লম্বা চওড়া কবিও উক্ত সাহিত্যে অধুনা বর্ত্তমান। তাঁহাদের অপেক্ষা, বঙ্কিম বাবু, জ্ঞান গবেষণায় পাণ্ডিত্বে পরিশ্রমে বিলক্ষণ ক্ষুদ্র ব্যক্তি তাহাতে কিছুমাত্রও সংশয় নাই। কিন্তু ইহাতেও কিছুমাত্র সংশয় নাই, যে বড়ই হউন আর ছোটই হউন, পণ্ডিতই হউন আর মুর্খই হউন, বঙ্কিম বাবু একটা সাহিত্যের শ্রষ্টা—সংস্কারক ও পরিচালক—এ তিনই। প্রমাণ অদ্যকার বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য ও উহাদের উপর বঙ্কিমের হাতের স্পষ্ট পরিষ্কার "ছাপ"। এ 'ছাপ' যে দিন হইতে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের উপর পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে সেই

দিন হইতে যেন উহার মূর্ত্তি ফিরিয়াছে; সেই দিন হইতে যেন উহাতে শ্রী ও সৌন্দর্য্য শক্তি ও স্ফূর্ত্তি স্বত প্রবৃষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে আর—সর্ব্বোপরি—সেই দিন হইতে শিক্ষিত মহলে উহাদের কিছু কিছু আদরও হইতেছে। উপর উপর দেখিলে বঙ্কিম বাবু বঙ্গ-সাহিত্যে অধিক আর কি করিয়াছেন? 'খান কয়েক 'নবেল' উপন্যাস লিখিয়াছেন বৈত নয়? সেই উপ-ন্যাস কয়খানা, না হয় খুব ভালই হইয়াছে, পড়িতে বেশ মিষ্ট লাগে। ইহার অধিক আর কি? বড় জোর বঙ্কিমবাবু একজন দক্ষ উপন্যাস লেখক (novelist) এ সব কথা সত্য বটে। কিন্তু এই 'নবেলিষ্ট' বা উপ-ন্যাস লেখকের লেখনীতে যে একটা জিনিস আছে আর সেই জিনিসটা দ্বারা আমাদের সাহিত্যটা যেরূপ প্রভাবিত হইতেছে, ইহা যে সকল লোকে দেখিতে পায় না, সে সকল লোককে কথাটা বুঝাইতে বসা বিড়ম্বনা মাত্র। অতত্রব সে বিষয়ের চেষ্টা করিতেছি না। এস্থলে কেবল এই একটা কথা যে বঙ্কিম বাবুর ভক্ত মণ্ডলীর মধ্যে সাহিত্য ব্যবসায়ী এমত লোকও কখনও কখনও দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা প্রকৃত কথা না বুঝার দরুন, বঙ্কিম বাবুর গুণ গাইতে

বসিয়া কেবল অগৌরবই করেন। যাহা হউক মূল কথার অনুসরণ করি। বঙ্কিম বাবুর সাহিত্য-জীবনের বিকাশ অতি পরিপাটী। উহা কিরূপে কোন প্রণালীতে কোন কোন স্তর অতিক্রম করিয়া ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে তাহার কিঞ্চিম্মাত্রও পর্য্যালোচনা করা আমাদের একান্ত সাধ্যাতীত। এই প্রবন্ধের লেখক বঙ্কিম বাবুর সহিত সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত। তাঁহার প্রকাশিত পুস্তকাবলী ব্যতীত তৎসম্বন্ধে আর কিছুই অবগত নহেন। ফলতঃ আমরা বঙ্কিম বাবুকে কখনও চাক্ষুষ দেখি নাই, তাঁহার সহিত আলাপ করি নাই, তাঁহার পরিচিত লোকের সৎসঙ্গও আমাদের ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই। অতএব তাঁহার অধ্যয়ন কথোপকথন চিন্তা প্রণালী,—সংক্ষেপতঃ পূর্ব্বাপর প্রাত্যহিক জীবন গতি,—যদ্দ্বারা উপরোক্ত প্রশ্নের যথাযথ মীমাংসা হইতে পারে, সে বিষয়ে আমরা সম্পুর্ণ অনভিজ্ঞ। বঙ্কিম কৃত গ্রন্থাবলী স্তরে স্তরে সমালোচনা করিয়া কথাটা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝান যাইতে পারে কিন্তু তাহা করিবার স্থান ইহা নহে, আর সে বিষয়ে আপাততঃ আমরা বড় প্রস্তুতও নহি। যাই হউক, বঙ্গ সাহিত্যে বঙ্কিম বাবু যে ভাবে যে প্রণালীতে

সপ্রকাশ, তাহার ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ের উপর একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে, যে Substance of religion is culture, এ কথা তাঁহার সাহিত্য-জীবনে অতি সুন্দররূপে, প্রমাণীকৃত হইতেছে। বঙ্কিম বাবু এক দিকে সাহিত্যের 'খাস' মঞ্চ হইতে গৌণ কল্পে যেমন ধর্ম্মনীতি প্রচার করিতেছেন অপর দিকে তেমনি সাহিত্যালোচনার দ্বিতীয় স্তর হইতে প্রথম বা সর্ব্বোচ্চ স্তরে অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধর্ম্ম প্রচারের দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

প্রথমতঃ বঙ্কিম বাবুর বাল্য রচনা। এই রচনা সাহিত্যাংশে খুব অস্ফুট রচয়িতা নিজেই বলেন উহা অপাঠ্য—উহা 'হিঁয়ালি'। উহা অপাঠ্যই হউক আর হিঁয়ালীই হউক আর "পুস্তক বিক্রেতার আলমারিতেই পচুক, উহাতে এমত এক আধ কণিকা দ্রব্য পাওয়া যায়, যাহা ভাবি প্রতিভার পরিচায়ক। পঞ্চদশবর্ষীয় বালক বঙ্কিমের 'ললিত' নামক গল্পটীর গঠনে বেশ একটু নাটকীয় শক্তির আভাস পাই। যাহা হউক সর্ব্বোপরি এই অস্পষ্ট অমিষ্ট বাল্য রচনায় আমরা যাহা দেখিতে পাই তাহা রচয়িতার মানসিক অবস্থা। বাল্য কালের রচনায় নিজের প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি সমাঙ্কিত

করা গ্রন্থকার মাত্রেরই কিরূপ স্বাভাবিক বলিলেও চলে। বালক বঙ্কিমের সর্ব্ব প্রথম রচনাই, ট্রাজিডি। রসিক চূড়ামণি তরুণ বয়সে তরল রসের ছড়াছড়ি না করিয়া 'শেষের সে দিন' ভাবিতে বসিয়াছিলেন ইহা অনেকের নিকট আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে। বাল্যাবস্থাতেই বঙ্কিমের মন সংসারের অসারতা অনুভব করিয়া'ললিতা-মন্মথের' প্রণয় ও তাহার পরিণাম বর্ণনা স্থলে বলিলঃ—

> মানবের কি কপাল! সংসার কি ছার!
> বহিতে জীবন ভার কে চাহিবে আর!

পরন্তু,—

> এ গভীর স্থির মত হয়েছে এখন
> কারো অনুরাগী নই বিনা সনাতন।
> জপিয়া পবিত্র নাম হইব পতন॥
> অনন্ত মহিমা স্মরি ছাড়িব এ দেহ,
> জানিবেনা শুনিবেনা কাঁদিবেনা কেহ।

এ'গভির মত' তখন সম্পূর্ণরূপে 'স্থির' হইয়াছিল কি না সে কথা নিশ্চয় করিয়া বলা অবশ্য কঠিন। কিন্তু 'মত স্থির' না হইলেও মনের স্বাভাবিক গতি যে দিকে তাহা বেশ বুঝা যায়।

তার পর আজি গুরু শিষ্যের কথোপকথনে বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন ;—

"অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত 'এ জীবন লইয়া কি করিব?' 'লইয়া কি করিতে হয়?' সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি। অনেক পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি। অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি এবং কার্য্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। জীবনের স্বার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি।" ইত্যাদি।

এই পরিশ্রমের মুখ্য ও গৌণ ফল কি তাহা বঙ্গীয় পাঠক জ্ঞাত আছেন এবং অধুনা ইয়ুরোপীয় সমাজেও তাহার কথঞ্চিৎ বিস্তৃতি হইতেছে।

'জীবন লইয়া কি করিবেন?' এই প্রশ্নের উত্তরানুসন্ধানে বঙ্কিম সাহিত্যে জীবন ঢালিলেন, সাহিত্যের সমগ্র ভূমি বেড়িয়া যথাসাধ্য পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। অনেক পরীক্ষা অনেক শিক্ষা হইল। অনেক পথ অনেক মত দেখিলেন। স্বভাবদত্তা সৌন্দর্য্যস্পৃহা সুকুমার সাহিত্যের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট করিল। স্বভাবোপযোগী ক্ষেত্র পাইয়া প্রতিভা প্রস্ফুট

হইতে লাগিল। বঙ্কিম সৌন্দর্য্যের জন্য সৌন্দর্য্য প্রচার করিলেন। তদ্দারা তাঁহার জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে হউক সৌন্দর্য্যের অপর পৃষ্ঠা ধর্ম্মও প্রচারিত হইল। 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে 'রজনী' পর্য্যন্ত যে কয়েকখানি কাব্য তাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বড় একটা ধর্ম্ম কথা না থাকিলেও তদ্দারা গৌণ কল্পে ধর্ম্ম-নীতিই প্রচারিত হইয়াছে। তবে এ কথা অনেকে বুঝিয়া উঠিতে পারে না বটে। কিন্তু কোন কথাই বা অনেকে বুঝিয়া থাকে? ফলতঃ বঙ্কিমের যে কিছু রচনা,—নগেন্দ্র দেবেন্দ্র হইতে, প্রতাপ চন্দ্রশেখর, ও রোহিনী শৈবলিনী হইতে সূর্য্যমুখী প্রফুল্লমুখী পর্য্যন্ত 'কু সু' যাহা কিছু সমস্তরেই চিত্ত-শুদ্ধি উদ্দেশ্য। রসের ঢল ঢল ঢেউ হইতে গাম্ভীর্য্যের অতলস্পর্শী দৃশ্য পর্য্যন্ত যাহা কিছু তাহার একই মাত্র উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোন্নতি। এখন স্মরণ করিয়া দিতে হইবে কি যে চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তোন্নতিই ধর্ম্ম। তুমি বলিবে 'দু'খান নবেল পড়িয়া চিত্তশুদ্ধির আশা কোথায়? আমি বলি তাহাই যদি হয় তবে বেদ বাইবেল পুরাণ কোরাণ ঘাঁটিয়াই বা সে আশা কোথায়?

'বঙ্গদর্শনে' বঙ্গ-সাহিত্যের নবীন সংস্কার নব-যুগোৎ-

পাদন করার পর বঙ্কিম বাবুর কিছু কাল বিশ্রাম। এ বিশ্রাম বড় বিশ্রাম নয়, পরিশ্রমের পরাকাষ্ঠা বলিয়াই ত আমাদের বোধ হয়। এই বিশ্রাম বা পরিশ্রমের ফল অনেক। আর সেই ফল আজি নানা আকারে বঙ্গ-সাহিত্যে অনুপ্রবৃষ্ট হইতেছে। সাহিত্যের খাস ইলাকা হইতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে আগমনের প্রথমাভাস 'আনন্দমঠে।' আনন্দমঠে অনেকটা আত্ম-প্রকাশ। বঙ্কিমবাবুর রাজনীতি ও ধর্ম্ম বিশ্বাসের ভিত্তিস্থল কোথায় তাহা আনন্দমঠে বেশ দেখিতে পাই। আর জননী জন্মভূমির জন্য কবি হৃদয় যে কিরূপ কাতর, কিরূপ উদ্বেলিত ও উচ্ছাসিত,তাহা 'বন্দে মাতরং' সঙ্গীতে পাঠ করি। আনন্দমঠে যাহার আভাস দেবীচৌধুরাণীতে তাহার প্রকাশ। যে নিষ্কাম কর্ম্ম চন্দ্রশেখরে অঙ্কুরিত প্রফুল্ল মুখীতে তাহা বিস্ফারিত। এইরূপে সাহিত্যের পরিণাম ধর্ম্মে,—সে ধর্ম্মও কিন্তু সাহিত্য। সাহিত্যের ধর্ম্ম-পরিণামের প্রথম সোপান 'আনন্দমঠ' দ্বিতীয় 'দেবী-চৌধুরাণী'; তারপর 'প্রচারে' সে পরিণাম 'ষোলকলায়' পূর্ণিত। প্রচারে ধর্ম্মপ্রচার হইতেছে— কিন্তু উৎপন্ন হইতেছে অতি উপাদেয় সাহিত্য। বেদ-ব্যাখ্যা বঙ্গসাহিত্যের বিলক্ষণ পুষ্টিসাধন করিবে।

'কৃষ্ণচরিত্রে' মহাভারত সমালোচন সুকুমার সাহিত্যেরই অন্তর্গত।

বঙ্কিম বাবু ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিয়া কোন পথে যাইতেছেন তাহা তিনি নিজেই বলিয়াছেন (প্রচার ২০২ পৃঃ ১ খণ্ড) প্রথমতঃ ধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তি কি? দ্বিতীয়তঃ হিন্দুধর্ম্ম সেই ভিত্তির উপর স্থাপিত কি না? এই দুই কথা বুঝান আপাততঃ তাঁহার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশে তিনি ধর্ম্মের বিবিধ ভাগ বিভাগ শাস্ত্রের স্তরে স্তরে সমালোচনা করিতেছেন। এই সমালোচনা শুদ্ধ হউক আর অশুদ্ধ হউক, ইহার ফল ভবিষ্যতে যাহাই দাঁড়াক, ইহা যে আমাদের সাহিত্যের যৎপরোনাস্তি পুষ্টিসাধন ও উপকার করিতেছে, ইহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার—করিবে না। বঙ্কিম বাবুর এই ধর্ম্মালোচনায় বঙ্গ সাহিত্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উপকৃত হইতেছে।

সংক্ষেপতঃ বঙ্কিমে আমরা সাহিত্য মূলক ধর্ম্ম দেখিতে পাইতেছি আর কেশবে দেখিতেছি ধর্ম্ম-মূলক সাহিত্য। ইত্যাগ্রে যাহা বলিয়াছি যদি বিষদ হইয়া থাকে তদ্দারা প্রথম কথাটা বুঝা যাইবে। শেষোক্ত কথাটা কেশবচন্দ্রের নিজের গোটাকতক কথা—এখানে উদ্ধৃত করিয়া আমরা খোলসা করিব।

"আমার জীবন বেদের প্রথম কথা প্রার্থনা। যখন কেহ সহায়তা করে নাই, যখন কোন ধর্ম্ম-সমাজে সভ্যরূপে প্রবৃষ্ট হই নাই, ধর্ম্মগুলি বিচার করিয়া কোন একটি ধর্ম্ম গ্রহণ করি নাই, সাধু বা সাধক শ্রেণীতে যাই নাই, ধর্ম্ম জীবনের সেই উষাকালে "প্রার্থনা কর প্রার্থনা কর"এই ভাব, এই শব্দ হৃদয়ের ভিতরে উত্থিত হইল। ধর্ম্ম কি জানি না ও ধর্ম্মসমাজ কোথায়, কেহ দেখায় নাই; গুরুকে কেহ বলিয়া দেয় নাই; সঙ্কট বিপদের পথে সঙ্গে লইতে কেহ অগ্রসর হয় নাই, জীবনের সেই সময়ে আলোকের প্রথমাভাশ স্বরূপ "প্রার্থণা কর, প্রার্থনা ভিন্ন গতি নাই" এই শব্দ উচ্চারিত হইত। কেন, কিসের জন্য প্রার্থনা করিব তাহাও সম্যকরূপ বুঝিতাম না, তর্ক করিবারও সময় হয় নাই। কেন প্রার্থনা করি জিজ্ঞাসা করিবার লোকও ছিল না। কে প্রার্থনা করিতে বলিল তাহাও কোন লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম না। ভ্রান্ত হইতে পারি এ সন্দেহও হইল না। প্রার্থনা করিলাম। ভিত্তি স্থাপনের সময় কে অট্টালিকার সৌন্দর্য্য চিন্তা করে? কি রঙ দিব বারাণ্ডায় তাহা কি মানুষ তখন ভাবে? তখন কেবল অটল ভাবে ভিত্তিই স্থাপন করিতে হয়।

প্রার্থনা কর বাঁচিবে, চরিত্র ভাল হইবে,” এই কথাই জীবনের পূর্ব্ব দিক হইতে পশ্চিমে, উত্তর দিক হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত হইত। এই ভাবনারই ভাবুক হইয়াছিলাম ; এই কর্ম্মের কর্ম্মী হইয়াছিলাম। প্রার্থনাগুরু অসহায় জনের অপার সহায়। এই এক জনকেই চিনিয়াছিলাম। এক জনের সঙ্গেই আলাপ করিয়াছিলাম ; এক জনের সঙ্গেই আলাপ হইয়াছিল ; আর কাহাকেও জানিতাম না। ধর্ম্ম-বন্ধু কেহ ছিল না। আকাশের দিকে তাকাইতাম, কোন বিধানের কথা শুনিতাম না, কোন ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতাম না। গির্জ্জায় যাইব, কি মসজিদে যাইব, দেবালয়ে যাইব, কি বৌদ্ধদিগের দলে যোগ দিব, তাহার কিছুই জানিতাম না। প্রথমেই বেদ বেদান্ত কোরাণ পুরাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে প্রার্থনা তাহাই অবলম্বন করিলাম। আমি বিশ্বাসী ; বিচার করি, আর বিশ্বাস করি। একবার বিশ্বাস করিলে আর টলি না। চক্ষু দ্বারা বিচার করিলাম। হইয়াছে কি ? বিচারের জন্য এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম। “হইয়াছে আরও বল” এই উত্তর পাইলাম। সকালে একটি আর রাত্রিতে একটি লিখিয়া প্রার্থনা সাধন করিতে লাগিলাম। উষা হইতে প্রাতঃকালে আসিলাম। ক্রমে

বেলা হইতে লাগিল। চারি দিক আচ্ছন্ন ছিল অন্ধকারে পরিষ্কৃত হইয়া পড়িল। পথ ঘাট বাড়ী ঘর সকল দেখা গেল। এই প্রার্থনা করিতে করিতে সিংহের বল দুর্জ্জয় বল অসীম বল লাভ করিতে লাগিলাম। দেখি আর সে শরীর নাই, সে ভাব নাই। কি কথার বল কি প্রতিজ্ঞার বল, বলিলেই হয় প্রতিজ্ঞা করিলেই হয়। * * * কি পুস্তক পড়িতে হইবে, কি পুস্তক আলোচনা করিতে হইবে, কার কাছে যাইতে হইবে, কি আলোচনা করিতে হইবে, কিছুই জানিতাম না। সে অবস্থায় না ফেলিলে এত বিশ্বাস বোধ হয় প্রার্থনার উপর হইত না। কেহ কিছু বলিলে চক্ষু বন্ধ করিয়া বলিতাম "প্রার্থনা! কোথায় রহিলে? বিপদ কালে কাছে এস।" আমি বাঙ্গালা ভাল জানিতাম না যে ভাষাবদ্ধ করিয়া প্রার্থনা করি। ভাব রাখিতে পারিতাম না। জানালার ধারে বসিয়া চক্ষু খুলিয়া একটি কথা বলিতাম। তাহাতেই আনন্দ ভারি ……।"

জীবন-বেদ ৮২+৩ পৃঃ।

বস্তুতই কেশব বাবু ভাল বাঙ্গালা জানিতেন না। জানিবার তাদৃশ সুবিধা হয় নাই। কিন্তু তবুও দেখুন বঙ্গ সাহিত্যে তিনি কি অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

কেশবের নিকট বাঙ্গালা ভাষা ঋণি ইহা বলা কি অত্যুক্তি? বঙ্গ সাহিত্যের অংশ বিশেষ কেশব কর্ত্তৃক সৃষ্ট ইহা বলিলেও অন্যায় হয় না। সরল সাহিত্য বঙ্গ ভাষায় বাগ্মীতার, কেশবই প্রবর্ত্তক। বঙ্গ ভাষা ভাল করিয়া শিখিতে পান নাই তবুও তাহাতে তাঁহার কি প্রকার দখল জন্মিয়াছিল ও তাঁহার বাঙ্গালা কিরূপ সহজ স্বাভাবিক সুমিষ্ট ও কবিত্বপূর্ণ তাহা যিনি কেশবের জীবন কালে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম-মন্দিরে গিয়াছেন তাঁহার অবিদিত নাই। উপরে কেশবের যে কয়টা কথা, ভিন্ন উদ্দেশে, উদ্ধৃত করা গিয়াছে, কেবল সেই কয়টা কথা পাঠ করিয়াও, পাঠক আমাদের এই উক্তির প্রমাণ পাইতে পারেন। কিন্তু কেশবের যে এই সাহিত্য ইহা তাঁহার অবিচলিত ধর্ম্মানুরক্তিরই ফল। তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু 'প্রার্থনা'ই ইহার মূল ভিত্তি।

বঙ্কিমের ধর্ম্মানুরতি সাহিত্য ক্ষেত্রের ফল। কেশবের সুকুমার সাহিত্য, সৌন্দর্য্যময়ী ভাষা ধর্ম্ম ভূমির ফল। উভয়ই বঙ্গের সুসন্তান। উভয়ের স্বতন্ত্র প্রকৃতির প্রতিভা—যেরূপ ধর্ম্ম ও সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিয়াছে তাহা বস্তুতই অধ্যয়নের বিষয়।

কেশব ও বঙ্কিম বাবুর প্রতিভার কথা পাড়িয়া

আমরা এই প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি, এখন শেষও করিব সেই কথায়।

বৎসরেক পূর্ব্বে 'দেবী চৌধুরাণী' কাব্যের সমালোচনা কালে, কেশব ও বঙ্কিম কর্ত্তৃক বঙ্গ সমাজ যেরূপ প্রভাবিত হইয়াছে তাহার বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছিলাম। কিন্তু এই দুই ব্যক্তির মধ্যে পারস্পারিক ব্যক্তিগত সম্বন্ধ কিরূপ ছিল ?

এই বঙ্গভূমে এমন দিন গিয়াছে যখন,—

"চণ্ডীদাস শুনি, বিদ্যাপতি গুণ, দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি শুনি, চণ্ডীদাস গুণ, দরশনে ভেল অনুরাগ ॥
দুহুঁ উৎকণ্ঠিত ভেল।
সঙ্গহি রূপ নারায়ণ কেবল বিদ্যাপতি চলি গেল ॥
চণ্ডীদাস তব রহই না পারই চলল দরশন লাগি।
পন্থ হি দুহুঁ জন, দুহুঁ গুণ গায়ত, দুহুঁহিয়ে দুহুঁরহুঁ জাগি ॥
দৈবহি দুহুঁ দোঁহা দরশন পাওল, লখই ন পারই কোই ॥
দুহুঁ দোঁহা নাম শ্রবণে তহি জানল, রূপ নারায়ণ গোই ॥"

কিন্তু এখন হায়! এখন আর সে দিন নাই;— অথচ শুনিতে পাই আমাদের এটা উদারতার কাল। তখন "পন্থহি দুহুঁ গুণ গায়ত, দুহুঁ হিয়ে দুহুঁ রহুঁ জাগি।" কিন্তু এখন ? এখনকার গুণবানেরা প্রায়ই গুণ গ্রহণ করিতে কাতর, আত্ম-গৌরবে বিভোর।

সহানুভূতি শূন্য স্ব স্ব প্রধান। এখন আন্তরিক ভাবে অন্যের গুণ পাওয়া দূরে যা'ক, কেহ অন্যের গুণের কথা কানে শুনিবা মাত্র চটিয়া তাহার প্রতিবাদ করে। এই "হামবড়া"র বাজারে কদাচিৎ যদি কেহ অন্যের গৌরব করে সে চাটুকার শ্রেণীভুক্ত হয়। গুণগ্রাহী প্রকৃত ভাবুক লোক ইদানী বস্তুতই বড় বিরল হইয়া পড়িতেছে। ছিদ্রানুসন্ধান করা ও নাক সিকায় তুলিয়া তীব্র সমালোচনা করাই এখনকার দিনে বাহাদুরী।

কেশব ও বঙ্কিম বাবু উভয়ের কাহারও সহিত আমরা কখনও পরিচিত নহি, অতএব তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর কিরূপ ভাব ছিল আমরা আদৌ অবগত নহি। কিন্তু সে দিন কেশব সম্বন্ধে বঙ্কিমের নিম্নোক্ত উক্তি দেখিলাম।

"শিষ্য।—বৈদ্য কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মণ শিষ্য, ইহা আপনি সঙ্গত মনে করেন?

গুরু।—কেন করিব না? ঐ মহাত্মা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ গুণ সকলে ভূষিত ছিলেন। তিনি সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগ্য পাত্র।

শিষ্য।—আপনার এ হিন্দুয়ানিতে কোন হিন্দু মত দিবে না।

গুরু।—না দিক কিন্তু ইহাই হিন্দুধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম।”

হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা হিন্দুয়ানি প্রচার করিতে বসিয়া বঙ্কিম বাবু জনৈক শুদ্র কুলোদ্ভব ব্যক্তিকে সুব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বলিতে সাহসী হইলেন, অবশ্য তাঁহার প্রতিভা প্রভাবে আর তাঁহার “একবরী গজের’ জোরে। কিন্তু উপরি উক্ত উক্তিতে তাঁহার হৃদয় মনের যে উন্নত ভাব প্রকাশিত তাহা বড়ই মধুর, বড়ই মহৎ।

কাল যে কেশবকে তাঁহার মন্ত্র-শিষ্যগণ অপমানিত পদদলিত করিয়াছিল আজি সেই কেশবকে ভিন্ন মতাবলম্বী লোকে, দেববৎ সমাস্থান করিতেছেন, ইহা যথার্থই বড় আনন্দের বিষয় কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

কেশবের প্রতি বঙ্কিমের এই প্রীতি-অনুরাগ ও যথাযোগ্য সম্ভ্রম বস্তুতই বড় তৃপ্তিকর। কেশবচন্দ্র বঙ্কিম বাবুর ধর্ম্ম-প্রচারের এই নূতন অনুষ্ঠান দেখিয়া কি বলিতেন জানিতে স্বভাবতই মন কৌতুহলাক্রান্ত হয়। কিন্তু হায়! সে মহাত্মা আর এ ধরাধামে নাই। বঙ্গদেশ কাঁদাইয়া, সকল দেশের সাধু মহাত্মা সুশিক্ষিত লোককে কাঁদাইয়া তিনি ‘স্বর্গারোহন’ করিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের প্রতিভা আর নবভাবে নবরাগে বঙ্গবাসীর

হৃদয়ে স্বর্গের সুধা ঢালিবে না। ভগবানের নিকট প্রার্থনা, বঙ্কিম দীর্ঘজীবী হইয়া তাঁহার প্রতিভা দ্বারা দেশের মুখোজ্জ্বল করুন।

বঙ্কিম বাবুর ধর্ম্ম-সমালোচনায়, কেশব বাবুর কোন কোন মতের সহিত, তাঁহার বিলক্ষণ ঐক্য দেখা যাইতেছে। ভবিষ্যতে আমরা এই ঐক্যের পরিচয় দিলেও দিতে পারি। কিন্তু এই ঐক্যে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। যেমন ঈশ্বর এক ভিন্ন দুই নহেন, তেমনি প্রকৃত পরমার্থিক ধর্ম্মও এক ভিন্ন দুই নহে। অতএব তাহার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য হওয়াই আশ্চর্য্য।

ঈশ্বরের একত্ব—'একমেবাদ্বিতীয়ম' পৃথিবীতে ভূয়ো ভূয়ো যেরূপ প্রচারিত হইয়াছে, ধর্ম্মের একত্ব সংসারে সেইরূপ এক সময়ে প্রচারিত হইবে না কে বলিতে পারে? 'একমেবাদ্বিতীয়ম' আর্য্যঋষি সর্ব্বাগ্রে প্রচার করেন, ধর্ম্মের একত্বরূপ পরম রমনীয় নিত্য সত্যও আর্য্যভূমি হইতে উত্থিত হইয়া জগৎসংসারে ব্যাপ্ত হইবে না কে বলিতে পারে? কেশবচন্দ্র ইহার বীজ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন; বীজ ভবিষ্যতে মহৎ-বৃক্ষে পরিণত হইবে না কে বলিতে পারে? ধর্ম্ম এক। বিধান বিবিধ। ধর্ম্মের দ্বিত্ব সম্ভবে না। বিধা-নের সমন্বয়ে ধর্ম্মের একত্ব সপ্রকাশ। ধর্ম্ম এক। ধর্ম্ম সত্য ও নিত্য পদার্থ, 'সত্য নিত্য ধীর স্থির আভা-ময়!' "কোণিক বক্র রেখা হাইপার বোলার মধ্যস্থিত বক্র রেখাদ্বয়ের মত সাধু চরিত্র চিরদিনই ধর্ম্মের নিকট-

বর্ত্তী হইতে থাকে।" সামিপ্য ও সাযুজ্য কল্পে সাহিত্য এ সংসারে তাহার সাহায্য করে। পূর্ণ সাহিত্যই সাযুজ্য। এই পূর্ণত্ব প্রাপ্তব্য কি না ইহার বিচার করিতে বসা। অপূর্ণ মানবের ধৃষ্ঠতা।

কিন্তু আর না ধর্ম্ম ও সাহিত্যের 'দোহাই' দিয়া আমরা প্রসঙ্গে অপ্রসঙ্গে 'নানান কথা' পাড়িয়াছি। মহামতি পাঠক মার্জ্জনা করিবেন।*

---

* এই প্রবন্ধ যখন লিখি তখন, ইহা 'পুস্তকাকারে' প্রকাশ হইবে তাহা জানিতাম না,—জানিলে 'পুস্তকের মত করিয়া' লিখিবার অন্ততঃ চেষ্টাও করিতাম। একটি মাসিক পত্রের জন্য এ প্রবন্ধ প্রথমতঃ লিখিয়াছিলাম;—যে পত্রের জন্য লিখিয়াছিলাম, সেই পত্রের সম্পাদকের ইচ্ছায়, উপদেশে ও আনুকুল্যে এই যৎসামান্য প্রবন্ধ এব স্বতন্ত্র পুস্তক হইয়া দাঁড়াইল। অতএব এ দোষ কাহার সহৃদয় পাঠক যদি কেহ পাঠক জুঠেন,—বিবেচনা করিবেন।

'পুস্তক প্রকাশের' দোষ বস্তুতই আমার নহে। তবে আর্য্য-অতীতের আজকার এই আলোচনার আসরে বাঙ্গালীর বর্ত্তমানের বড়ই বাড়াবাড়ী এ পুস্তকে করা হইয়াছে বলিয়া যে কেহ দোষ দিতে চান, আমাকেই দিবেন। ~~যে দোষ ষোল আনাই আমার নিজস্ব~~।



সমাপ্ত।